প্রমীলা মহল

নটরাজন

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৮

প্রচ্ছদ : মঞ্জিত দাস

মুদ্রাকর :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষের শেষে ও
রাষ্ট্রপুঞ্জের নারী-দশকের প্রারম্ভে
পতি-গর্বে গরবিনী বন্ধু-পত্নী
শ্রীমতী ছায়া বিশ্বাসের
করকমলে—

দু'চার কথা

এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের প্রথমেই আমি একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে রাখতে চাই। অনুরোধটি হচ্ছে এই যে এর কাহিনীটি যেন কেউ যুক্তি দিয়ে বিচার করতে না বসেন, কারণ তা'হলে হয়তো তিনি হালে পানি পাবেন না এবং তাঁর পরিশ্রমটাই বৃথা যাবে।

যুক্তিগ্রাহ্য অনেক কিছুই তো আমরা রাত-দিন দেখছি, শুনছি। এমনকি কল্পনাকেও তো আমরা যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে কতই না মেহনত করছি। তেমনি একটা কাল্পনিক কাহিনী না হয় যুক্তির বাইরেই রয়ে গেল। কি যাবে আসবে তাতে? অবশ্যি এ'কে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে আমি যে একেবারেই কোন চেষ্টা করি নি তা' নয়। ঘটনাগুলোকে ঘটিয়েছি স্বপ্নের মধ্যে। কিন্তু তাতেও কার্যসিদ্ধি হয় নি আমার, কারণ স্বপ্নের মধ্যে কাহিনীর সুষ্ঠু সমন্বয় প্রায়ই থাকে না, অথচ এই কাহিনীতে তা' রয়েছে। অবশেষে এই বলে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছি যে লেখার প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় পাঠকের আনন্দলাভ, আর এই কাহিনীটি যদি পাঠক-পাঠিকাদের সত্যিই আনন্দ দান করতে সক্ষম হয় তা'হলেই বুঝবো এর সার্থকতা। যুক্তিকে তখন আমল না দিলেও চলবে।

পরিশেষে আর একটি কথা—বলতে গেলে এটাই প্রধান কথা—এই কাহিনীটি বেশ কিছুকাল আগে একটা বিখ্যাত মাসিকপত্রে যখন দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল তখন এর পক্ষে-বিপক্ষে একটা প্রচণ্ড সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল পাঠক মহলে। এমনকি সেই ঝড় থামাতে কর্তৃপক্ষকেও সেদিন যথেষ্ট হিমসিম খেতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সেদিনের সেই সমালোচনা-কারীগণ সবাই ছিলেন মহিলা।

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য তথা কৈফিয়ত মাত্র একটাই, আর সেটা হচ্ছে এই যে কাহিনীটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কাউকে খাটো কিম্বা ছোট করা নয়। মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে মায়ের জাতকে ছোট কিম্বা খাটো করার কথা কল্পনাও করতে পারি না। নারী ও পুরুষের মধ্যে কেউ ছোট কিম্বা বড়ো নয়, জীবজগতে নারী ও পুরুষ যে একে অন্যের পরিপূরক—সেটাই কেবল আমার বলার উদ্দেশ্য। তাতে আমি সফল হয়েছি কিনা তা' বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের হাতে।

সবশেষে বইখানির প্রকাশক শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমার কথা।

—নটরাজন

শুধু জল আর জল।

দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি অশান্ত শিশুর মত সর্বদাই চঞ্চল, হেলছে দুলছে ঘুরপাক খাচ্ছে বাতাসের তালে তালে। মানা করার কেউ নেই। শাসনের অক্টোপাশে বাঁধা পড়ে নি আজও। সেই শক্তিও নেই কারুর। শিশুর মত চপল হলেও এই বিস্তীর্ণ জলরাশি প্রকৃতিতে ভয়ঙ্কর। মৃত্তিকার সঙ্গে যেন চিরকালের বিরোধ তার। তাই নিষ্ফল আক্রোশে একটার পর একটা ঢেউ বারে বারে এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। সগর্জনে যেন ধমক দিচ্ছে তাকে।

দূরে সীমাহীন জলরাশি আকাশের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে—নীল জলরাশি হারিয়ে গেছে আকাশের নীলিমায়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য।

সেই অপরূপ দৃশ্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে উঠেছিল সমাপ্তিকার। বড়ই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল নিজেকে, বড়ই অকিঞ্চিৎকর।

সমুদ্রের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন সূঁচের মত বিঁধছিল সমাপ্তিকার গায়ে। সাগরের জলে ডুবে যাওয়া সূর্যের শেষ রশ্মির উত্তাপটুকুও আর ছিল না তখন। বারান্দার শান-বাঁধানো রেলিংয়ের ওপর তার অনাবৃত হাত দু'খানা যেন ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না সমাপ্তিকার। তার দৃষ্টি তখন দূরে—বহুদূরে।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে পুরীর সমুদ্রতীরে এই হোটেলে এসে উঠেছে সমাপ্তিকা। একাই এসেছে। অনেকটা জেদের বশেই একা আসতে হয়েছে তাকে। নইলে পৌষের হাড়-কাঁপানো শীতে এই অসময়ে এখানে বেড়াতে আসবে কেন সে?

মেয়ের পুরী যাওয়ার কথা শুনে পার্বতী বলেছিলেন, সেকি? এই অসময়ে কেউ পুরী বেড়াতে যায় নাকি?

জবাবে সমাপ্তিকা বলেছিল, কেউ না গেলেও আমি যাবো। এখানে শুয়ে বসে আর মন টেকে না আমার।

—কিন্তু তাই বলে এই অসময়ে পুরী ? তাও আবার একা ? প্রশ্ন তুলেছিলেন পার্বতী।

—আমি আর কী করতে পারি, মা ? সবিতা, ছন্দা, অঞ্জলি সবাইকে এত করে বললাম, কিন্তু কেউ যেতে রাজী হল না, ওরা হচ্ছে সব ঘরকুনো। যত বড়াই কেবল মুখে।

—ঘরকুনো হতে যাবে কেন ওরা ? ওদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে, বলেছিলেন পার্বতী, সবাই তো আর তোমার মত খেয়ালী নয়।

থম্‌থমে মুখে খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সমাপ্তিকা। পার্বতী বুঝতে পারেন এটা হচ্ছে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ। মেয়ের চরিত্রের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত তিনি। এমন একগুঁয়ে জেদী মেয়ে এই ভূ-ভারতে আর কোথাও আছে বলে তাঁর জানা নেই। কলেজে পড়া এই মেয়ের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠার জো নেই। যুক্তি দিয়ে তর্ক করে নিজের জেদকে সে বজায় রাখবেই। তাই এমন মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন পার্বতী।

কিন্তু তাঁর মা অর্থাৎ সমাপ্তিকার দিদিমা বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী এসে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেন। হেসে পার্বতীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, তুই এত উতলা হয়ে উঠেছিস কেন, পাবি ? আমাদের সমু একটু জেদী ! তা' বয়সকালে একটু জেদী থাকা ভালো। তারপর যেদিন আমার সোনার চাঁদ এসে সমুর পাশে দাঁড়াবে সেদিন দেখবি কোথায় চলে যাবে ওসব। বলেই বৃদ্ধা সমাপ্তিকার দিকে তাকিয়ে ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসতে থাকেন।

তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে সমাপ্তিকা। ঐ একটি মাত্র ঠাট্টার বিষয় ছাড়া দিদিমার অন্য সব ঠাট্টা সে হাসিমুখে সহ্য করতে পারে। কিন্তু হয়েছে এমন, সুযোগ পেলেই মাতঙ্গিনী ঐ বিষয়টি নিয়েই ঠাট্টা করবে তাকে। রেগেমেগে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়েও কোন ফল হয় না।

মাতঙ্গিনী কেবল কৌতুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে থাকেন।

সেদিন সেই পুরী যাওয়ার বিষয়টাকে কেন্দ্র করে মা-মেয়ের মধ্যে একটা তর্কের ঝড় হয়ত বয়ে যেত। কিন্তু এমনি সময় পূজো শেষ করে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন মাতঙ্গিনী। একবার মেয়ে ও একবার নাতনীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চেষ্টা করে তিনি বলেছিলেন, তা' সমু যদি পুরী বেড়াতে যেতে চায় তো যাক না, তাতে তুই বাধা দিচ্ছিস কেন, পাবি? কলেজ তো এখন বন্ধ। দিনকাল যে রকম চলছে তাতে কবে যে খুলবে ভগবান জানেন। এই সময় যদি মেয়েটা একটু বাইরে বেড়াতে যেতে চায় তো ক্ষতি কি?

—কিন্তু তাই বলে এই অসময়ে একা একা পুরী যাবে? ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠেন পার্বতী। মেয়েকে সমর্থন করায় মায়ের ওপরই মনটা কেমন যেন খাপ্পা হয়ে ওঠে। তার নিজের ধারণা দিদিমার সমর্থন পেয়ে পেয়েই মেয়েটা এত একগুঁয়ে হয়ে উঠেছে।

পার্বতীর কথার জবাব দিতে যাচ্ছিলেন মাতঙ্গিনী। কিন্তু তার আগেই দিদিমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে সমাপ্তিকা, দেখ তো দিদিমা, মা বলছেন পুরী যাওয়ার পক্ষে এটা নাকি অসময়। তা' তুমিই বল, বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে অত সময়-অসময় বাছ-বিচার করলে কি বেড়াতে যাওয়া চলে?

—নিশ্চয়ই না—কখনই না—। বৃদ্ধা সায় দেন নাতনীর কথায়।

উৎসাহিত হয়ে ওঠে সমাপ্তিকা। বলতে থাকে, আর অন্য কেউ সঙ্গী-সাথী হতে চায় না বলে কি নিজের ইচ্ছেটাকে বিসর্জন দিতে হবে? নাই বা কেউ গেল আমার সঙ্গে। তাই বলে কি নিজের যাওয়া বন্ধ করতে হবে?

মুখের ওপর একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে জবাব দেন মাতঙ্গিনী, না—না, তা কি হয়? সঙ্গী-সাথী পাওয়া গেল না বলে কি কেউ

নিজের বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করে? তা' ছাড়া সেখানে গিয়েই তো কত সাথী জুটে যাবে, কী বলিস্?

—তুমি ঠিক্ বলেছ, দিদিমা। সেখানে—। আরও কিছু বলতে গিয়ে মাতঙ্গিনীর মুখের দিকে নজর পড়তেই থেমে যায় সমাপ্তিকা। মাতঙ্গিনী তখন মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

—আবার ঐ সব কথা বলছ তুমি, দিদিমা? চোখ পাকিয়ে তাকায় সমাপ্তিকা।

নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দেন মাতঙ্গিনী, ওমা, আমি আবার কী বললুম? মক্কেলের জন্যে ওকালতি করতে গিয়ে এখন যে মক্কেলই উল্টে ধমকাচ্ছে!

হোটেলে নিজের কক্ষে মালপত্র নামিয়ে রেখেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল সমাপ্তিকা। প্রাকৃতিক দৃশ্যে সে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে পরিশ্রমের ক্লান্তির কথা একেবারেই মনে ছিল না তার। ভুলেই গিয়েছিল যে হোটেলের একখানা ঘর পেলেই কেবল তার চলবে না, সেই ঘরখানাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বাসোপযোগী করে তুলতে হবে তাকেই। হোটেলের সম্পত্তি চেয়ার টেবিল আল্না পালঙ্কগুলো হচ্ছে প্রতিমার খড়কুটোয় তৈরি কাঠামোর মত। তাতে মাটির প্রলেপ দেওয়ার মত সেগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখলেই তার সৌন্দর্য ,নচেৎ খড়কুটোর কাঠামো কাঠামোই থেকে যায়। প্রতিমা আর তৈরি হয় না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওসব চিন্তা একেবারেই স্থান পায় নি সমাপ্তিকার মনে। যা' হয় পরে করা যাবে, এখন একবার গিয়ে সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়াতেই হবে। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে দেখতে হবে সেই সৌন্দর্যকে—সমুদ্র যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

শীতের সন্ধ্যা। সমুদ্রের পাড়ে ভ্রমণ-বিলাসীদের ভিড় একেবারেই নেই। যা দু'একজন চোখে পড়ে তারা প্রায় সকলেই স্থানীয় লোক।

কর্মহীন দু-চারজন মুলিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে।

পায়ে পায়ে সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়ায় সমাপ্তিকা। গায়ের আলোয়ানটা একটু টেনে দেয়। তারপর মৃদুপদক্ষেপে চলতে থাকে সমুদ্রের পাড় ধরে। একটা অনির্বচনীয় আনন্দে প্রাণমন ভরে ওঠে তার।

অন্ধকার তখনও ঘনিয়ে আসে নি। একটু দূরে একজন লোক দাঁড়িয়ে কি যেন করছিল। তার পেছনদিকটা নজরে পড়ছিল সমাপ্তিকার। দীর্ঘদেহী পুরুষ। পরনে সাদা পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবী। তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছিল তার।

লোকটির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় সমাপ্তিকাকে। সামান্য একটু কৌতূহল—কী আঁকছে লোকটি?

অভিমন্যুর কিন্তু অন্যদিকে খেয়াল নেই। সে তখনও স্ট্যাণ্ডের ওপব দাঁড় করানো ক্যানভাসের ওপর তুলি চালাচ্ছিল নিবিষ্ট মনে।

সমুদ্রের ছবি। শিল্পীর তুলিব টানে শীতের সন্ধ্যার সমুদ্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ক্যানভাসের ওপর। প্রতিটি রেখার টানে যেন বেড়ে উঠছিল ছবির সমুদ্রের দুরন্তপনা। ঐ সীমাহীন বিরাটকে ক্যানভাসের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে শিল্পীর প্রচেষ্টা বাস্তবিকই সার্থক। বিরাট জলরাশির উপর ঘনায়মান অন্ধকারের মত ছবির সমুদ্রের ওপরও নেমে আসছিল অন্ধকারের যবনিকা—ঠিক যেন বাইরের প্রকৃতির একটি ছোট্ট সংস্করণ। হুবহু এক। এতটুকু তফাৎ নেই কোথাও। তেমনি জীবন্ত, তেমনি প্রাণচঞ্চল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই সমাপ্তিকার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, সুন্দর—চমৎকার!

কথাটা কানে যেতেই শিল্পীর তুলির আঁচড় থেমে যায়। ঘুরে দাঁড়ায় অভিমন্যু। একটু সময় তাকিয়ে থাকে সমাপ্তিকার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে। তার পটল-চেরা চোখ দু'টোর প্রশংস দৃষ্টির সঙ্গে

মিলিয়ে দেয় নিজের দৃষ্টি। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সমাপ্তিকার কথার প্রতিধ্বনি তোলে, সুন্দর—চমৎকার!

লজ্জা পায় সমাপ্তিকা। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড রাগ হয় লোকটার ওপর। উৎফুল্ল মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে তার। তীব্রদৃষ্টিতে একবার তাকায় অভিমন্যুর দিকে। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে থাকে নিজের পথে।

ধ্যানভঙ্গ হয়েছে সন্ন্যাসীর। বিঘ্ন ঘটেছে শিল্পীর সাধনায়। হাতের তুলি হাতেই থেকে যায় অভিমন্যুর। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে সমাপ্তিকার অপস্রিয়মান দেহটার দিকে।

কিছুই বাড়িয়ে বলে নি অভিমন্যু। সমাপ্তিকা সত্যিই সুন্দরী— অপূর্ব সুন্দরী। তার রূপের শুধু দীপ্তিই ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল একটা স্নিগ্ধতা। দীপ্তি আর স্নিগ্ধতার এই আশ্চর্য সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। শীতের সন্ধ্যায় সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে এমন একটি নারীর আসল রূপটিকে চিনে নিতে অভিমন্যুর শিল্পীমন মোটেই ভুল করে নি।

কিন্তু মেয়েটি অমন গম্ভীরভাবে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল কেন? কী এমন অন্যায় কথা সে বলেছে তাকে? রূপের প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে চলে গেল নাকি মেয়েটি? কিন্তু তার চোখে তো লজ্জার ভাব ছিল না। ছিল একটা ভর্ৎসনার প্রখরতা। তা'হলে নিশ্চয়ই রেগে গিয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু এতে রাগবার কী আছে? সুন্দরের প্রশংসা করা কি এতই অন্যায়?

আঁকার সরঞ্জাম কাঁধের থলির মধ্যে ভরে নেয় অভিমন্যু। স্ট্যাণ্ডটাকে ভাঁজ করে হাতে নিয়ে সে চলতে থাকে হোটেলের দিকে।

রাতে নিজের কক্ষে বিছানায় শুয়ে অশান্ত সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে ভাবতে থাকে সমাপ্তিকা, তা'হলে সে একাই কেবল পাগল নয়! কথাটা বলেছিল অঞ্জলি। পুরী যাওয়ার কথা তুলতেই সে

বলেছিল, তুই পাগল নাকি সমু? এই শীতে কেউ বেড়াতে যায় নাকি সেখানে?

এখন এখানে এসে সমাপ্তিকা দেখতে পাচ্ছে তার মত আরও কিছু পাগল আছে যারা শুধু এখানে বেড়াতেই আসে না, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার শীতের কন্‌কনে হাওয়ায় সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছবিও আঁকে।

গভীর রাতে সহসা ঘুম ভেঙে যায় সমাপ্তিকার। সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে তার কানে ভেসে আসে দরবারীর মিষ্টি আলাপ, কাছেই কে যেন বেহালা বাজাচ্ছে। সুরের মূর্চ্ছনায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদ-কাতর একটি মানুষ যেন তার সঙ্গীকে জন্মের মত হারিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে। এ কান্নার যেন শেষ নেই, সমাপ্তি নেই। সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে যেন চলছে এই কান্না।

শুনতে শুনতে নিজের চোখের পাতা দুটোও ভারি হয়ে ওঠে সমাপ্তিকার। এক সময় শেষ হয় সেই সুর। নিজের অজান্তেই সমাপ্তিকা আবার গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

পরের দিন বিকেলে সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে গিয়ে সমাপ্তিকা ঠিক একই জায়গায় দেখতে পায় অভিমন্যুকে। সেই একভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছিল সে। দূর থেকে অভিমন্যুকে দেখেই চলার গতি কমিয়ে দেয় সমাপ্তিকা। একবার মনে হয়, থাক্ ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। গেলেই হয়ত লোকটা আবার কী বলে বসবে। কিন্তু কথাটা মনে হতেই জেদ্ চেপে যায় সমাপ্তিকার। কী, সে ভয় করে নাকি ঐ লোকটিকে। লোকটির ভয়ে সে না বেড়িয়ে ফিরে যাবে? না, কিছুতেই না। পুরুষ জাতটার অমন হ্যাংলাপনার সঙ্গে তার ভালমতই পরিচয় আছে। দরকার হলে ঐ স্বার্থপর জাতটার হ্যাংলামোর ঠিক্ ঠিক্ প্রত্যুত্তর দিতেও সে জানে।

জোর কদমে সামনে এগিয়ে যায় সমাপ্তিকা। যেন দেখতেই পায় নি এমনিভাবে অভিমন্যুকে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েই কিন্তু তাকে থম্‌কে দাঁড়াতে হয় অভিমন্যুর ডাকে।

—শুনছেন ?

ঘুরে দাঁড়ায় সমাপ্তিকা। আগের দিনের মত লোকটা কোন কথা বলে ফেললে তার কী জবাব দিতে হবে তাই বোধহয় মনে মনে চিন্তা করতে থাকে।

অভিমন্যু কিন্তু সে পথ মাড়ায় না আজ। সমাপ্তিকা একটু এগিয়ে এলে চোখেমুখে একটা কুণ্ঠার ভাব ফুটিয়ে তুলে অভিমন্যু বললে, গতকাল আমার ব্যবহারে আপনি হয়ত বিরক্ত হয়েছেন। তাই আপনার ক্ষমা চাইছি—।

ক্ষমাপ্রার্থী একজন ভদ্রলোকের এমনধারা কথার জবাব কড়া ভাষায় দেওয়া চলে না। তা'ছাড়া সমাপ্তিকা তাকিয়ে দেখে অভিমন্যুর চোখেও কোন কৃত্রিমতার ছাপ নেই। একটা আন্তরিকতার ভাব যেন ফুটে উঠেছে সেখানে।

তাই সে মৃদু হেসে জবাব দেয়—না না, বিরক্ত হব কেন—।

বলতে বলতে সমাপ্তিকা স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করানো ছবিটার দিকে তাকায়। তারপর, কেবলমাত্র ভদ্রতার খাতিরেই আবার বললে, আপনার ছবিটা শেষ হয়ে গেল ?

মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে জবাব দেয় অভিমন্যু, হ্যাঁ, প্রায় শেষ করে এনেছি। তারপর মৃদু হেসে আবার বললে, একা একা কী আর করি বলুন ? এসব নিয়েই সময় কাটাই।

ছবিটার দিকে প্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন আবার বলতে যাচ্ছিল সমাপ্তিকা। কিন্তু আগের দিনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে সামলে নেয় নিজেকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, আচ্ছা চলি।

—এদিকে কোথায় চললেন ? প্রশ্ন করে অভিমন্যু।

—একটু বেড়াতে। জবাব দেয় সমাপ্তিকা।

—আপনি সম্ভবত এখানে নতুন এসেছেন। এর আগে বোধহয় আসেন নি এদিকে ?

কথাবার্তা সংক্ষেপ করে চলে যেতে চাইছিল সমাপ্তিকা। কিন্তু

একজন ভদ্রলোক যদি যেচে আলাপ করতে চায় তো জবাব না দিয়ে উপায় কী ?

তাই জবাব দিতে হয় তাকে, না, এখানে আমি নতুন নই। পাঁচ-ছ' বছর আগে একবার এসেছিলাম।

—এই পাঁচ-ছ' বছরেই দেশের লোকের স্বভাব চরিত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তা'ছাড়া পুরীতে বেড়াবার সিজনও এটা নয়। চেঞ্জারেরও ভিড় নেই। তাই বলছি সন্ধ্যার মুখে একা ওদিকটায় যাবেন না। বিপদে পড়তে পারেন।

—কীসের বিপদ ? প্রশ্ন করে সমাপ্তিকা।

—চোর-ছ্যাঁচোরের উপদ্রব আর কী। আপনাকে একা পেয়ে হয়ত আপনার গায়ের সোনাদানা জোর করে কেড়ে নিতে পারে।

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে সমাপ্তিকা। ভদ্রলোক কি শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছে তাকে ? না, সত্যিই ওদিকটায় একা যাওয়া বিপজ্জনক ?

অকস্মাৎ মনটা কঠিন হয়ে ওঠে তার। চারিদিকেই কেবল বন্ধন, শাসন, বিপদ—এ'গুলো সবই যেন ঈশ্বর স্ত্রীজাতির জন্যে তুলে রেখেছেন। মুক্তির স্বাদ নেই কোথাও। পুরুষ জাতটার স্বার্থপরতায় হাত-পা ছড়িয়ে হেসে-খেলে ইচ্ছেমত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকারও নেই নারীর। এদিকে যেও না, তোমার রূপ নিয়ে তুমি বিপদে পড়তে পারো। ওদিকে যেও না, তোমার শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমার সর্বস্ব অপহরণ করার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে নির্লজ্জ পুরুষের দল। এটা করো না, পুরুষের চেয়ে তোমার বদনাম হবে বেশি। ওটা করো না, তাতে তুমি পুরুষের বিরাগ-ভাজন হবে। সমস্ত জগৎ জুড়ে কেবল পুরুষের বিচারের মাপকাঠিতেই যেন নারীর বেঁচে থাকা। কেন এমন হবে ? কেন এই একচোখো নীতি ? কেন এই স্বার্থপরতা ?

অভিমন্যুর কথা যদি সত্যি হয় ত'াহলে ওদিকে বেড়াতে যাওয়া

চলে না। আবার না গেলেও ভদ্রলোক মনে করবে সে ভয় পেয়েছে। একমুহূর্ত দ্বিধা করে সে বললে, না বেশি দূর যাব না। বলেই সামনের দিকে এগিয়ে যায় সমাপ্তিকা।

আগের দিনের মত সেদিন রাতেও বেহালার সুরে ঘুম ভেঙে যায় সমাপ্তিকার। কান খাড়া করে সে শুনতে থাকে সেই স্বর্গীয় সুরের ঝঙ্কার। মনটা উদাস হয়ে ওঠে তার। বিরহীর দুঃখ বেদনার ছায়া পড়ে তার নিজের মনেও।

অকস্মাৎ কৌতূহলী হয়ে ওঠে সমাপ্তিকা। কে রোজ এমনিভাবে বেহালা বাজায় গভীর রাতে? বিছানা ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সে। না, বেশি দূরে নয়, কাছেপিঠেই কেউ বেহালা বাজাচ্ছে। হয়ত এই হোটেলের দোতলারই অন্য কোন কক্ষে।

দরজা খুলে একবার বাইরে গিয়ে লোকটিকে দেখে আসবে নাকি? না-না, তা' ঠিক হবে না। হোটেলের কেউ দেখে ফেললে হয়ত খারাপ কিছু ভাবতে পারে। এমন একটা অবস্থায় একজন পুরুষের পক্ষে বাইরে বেরিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসতে কোনই অসুবিধে ছিল না। কিন্তু সে নারী, তার সব কাজেই শত বাধা।

এই একটা স্বভাব সমাপ্তিকার। নিজের ব্যাপারে উচিত অনুচিত বিচার করতে গিয়ে আজকাল প্রায়ই সে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে। নীতির অসামঞ্জস্য প্রকটভাবে চোখে পড়ে। চিরকালের পুরুষ-বিদ্বেষী মনটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে তার।

দরজার কাছ থেকে সরে বিছানায় এসে আবার বসে সমাপ্তিকা। ততক্ষণে থেমে গেছে সেই সুরের লহরী। লেপটাকে গায়ে টেনে দিয়ে আবার ঘুমুতে চেষ্টা করে সে।

বেশি রাতে ঘুমোয় বলে অভিমন্যুর ঘুম ভাঙতে সেই বেলা দশটা সাড়ে দশটা। বিছানা ছেড়ে উঠেই সে প্রবেশ করে বাথরুমে। ঝাড়া দু'ঘণ্টা লাগে তার সেখানে। দাড়ি কামিয়ে স্নানপর্ব শেষ করে এসেই সে খেতে বসে নিজের ঘরে। তারপরই রং-তুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে

সমুদ্রের দিকে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে জলখাবার খেয়েই আবার ঘুম। রাতের খাবার খেতে জেগে ওঠে রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটায়। সমস্ত হোটেলটা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। তাই হোটেলে কে এল, কে গেল কোন খবরই রাখে না অভিমন্যু।

সেদিন কেন যেন একটু সকালেই ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল অভিমন্যু। বাক্স থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে আগুন ধরাতে গিয়ে তার খেয়াল হল দেশলাইয়ে কাঠি নেই একটাও। অগত্যা কলিং বেল্ টিপে সে চাকরটাকে ডাকতে থাকে। কিন্তু তারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। বিরক্ত হয়ে ওঠে অভিমন্যু। নেশার বস্তু হাতে, কিন্তু নেশা করার উপায় নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল নয় নম্বর রুমের কথা। তার নিজের রুম নম্বর সাত। মধ্যের আট নম্বরে কেউ নেই। এতদিন হোটেলের দোতলায় সে ছিল একা। দু'একদিন আগে সে লক্ষ্য করেছিল ঐ নয় নম্বর রুমে কে যেন এসেছে। কিন্তু পরিচয় হয়নি তার সঙ্গে। অভিমন্যুর মনে হল, এই সুযোগে দেশলাই চাইতে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়পর্বটাও সেরে ফেলা যাবে।

সিগারেট মুখে তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে নয় নম্বর রুমের খোলা দরজার সামনে আসতে আসতে বলতে থাকে অভিমন্যু, এক্সকিউজ্ মী। আপনাকে ডিস্টার্ব করছি। দয়া করে আপনার দেশলাইটা একবার—।

মুখের কথা মুখেই থেকে যায় তার। কক্ষের মধ্যে চিরুণী হাতে তখন চুল আঁচড়াচ্ছিল সমাপ্তিকা।

থতমত খেয়ে একমুহূর্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে অভিমন্যু। তারপর লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে ওঠে, কিছু মনে করবেন না, আমি ভেবেছিলাম—

একটু সময় থেমে সে আবার বললে, কিন্তু কী আশ্চর্য, আপনি তো কৈ বলেন নি যে আপনি এই হোটেলেই আছেন!

ভিজে চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয় সমাপ্তিকা, বলার কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই বলিনি।

একটু যেন আহত হয় অভিমন্যু। একটু আগে তার কণ্ঠে পূর্ব পরিচয়ের যে সুরটি ধ্বনিত হয়েছিল সমাপ্তিকার কথার ধরনে অকস্মাৎ যেন তার তাল কেটে যায়। ম্লান কণ্ঠে সে শুধু বললে, হ্যাঁ, তা'তো বটেই—

বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে যেতেই অপেক্ষাকৃত মোলায়েম কণ্ঠে বলে ওঠে সমাপ্তিকা, ওকি, চললেন যে? দেশলাই নেবেন না?

কুণ্ঠিত কণ্ঠে জবাব দেয় অভিমন্যু, দেশলাই আছে আপনার কাছে?

—হ্যাঁ, আছে। ঐ যে টেবিলের ওপর রয়েছে, নিন্।

এতক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল অভিমন্যু। একটু ইতস্তত করে সে বললে, ঘরে ঢুকবো?

—নয় তো গদ্খালির সেই ভুতুড়ে হাতের লেবু ছিঁড়ে আনার মত ওখান থেকেই হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিতে চান নাকি? জবাব দেয় সমাপ্তিকা।

দেশলাই হাতে বাইরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই সমাপ্তিকা আবার বললে, আপনি এখানে দাঁড়িয়েই সিগারেট ধরাতে পারেন। আমার কোনই অসুবিধে হবে না।

সিগারেট ধরায় অভিমন্যু। হাল্কা কণ্ঠে সমাপ্তিকা এবার বললে, আমার কাছে দেশলাই আছে বলে মনে করবেন না আমিও আপনার মত ধূমপানে অভ্যস্ত। বলেই মিষ্টি হাসি হেসে ওঠে।

অভিমন্যুও হাসে। একটু আগের সেই গম্ভীর পরিবেশটাও তরল হয়ে ওঠে যেন। একসময় সমাপ্তিকাই আবার প্রশ্ন করে, আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—তা' মাসখানেক হয়ে গেল।

—আচ্ছা, গভীর রাতে এই হোটেলে বেহালা বাজায় কে বলতে পারেন? শুনে তো মনে হয় হোটেলের দোতলার কোন ঘরে বসেই কেউ বেহালা বাজায়।

—তা'হলে আপনিও তা' শুনতে পেয়েছেন?

—বাঃ, পাব না কেন, আমি কি কালা নাকি?

—না-না। আমি সেকথা বলিনি। গভীর রাতে সেই সুব আপনিও যে শুনতে পেয়েছেন সেই কথাই কেবল বলছি। একটু থেমে অভিমন্যু আবার বললে, আপনি আছেন দোতলার এই নয় নম্বর ঘরে, আব আমি আছি সাত নম্বরে, দোতলার বাকি ঘরগুলো আপাতত ফাঁকাই পড়ে আছে।

—তা'হলে কে বাজায় বেহালা? আপনি? জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে অভিমন্যুর মুখের পানে তাকায় সমাপ্তিকা।

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর একটা কৃত্রিম কাঁচুমাচু ভাব ফুটিয়ে তুলে অভিমন্যু বললে, বিশ্বাস করুন, আপনি এই ঘরে আছেন জানলে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে কিছুতেই আমি বেহালা বাজাতাম না।

অভিমন্যুর কথার ধরনে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে সমাপ্তিকা। কিন্তু পরমূহূর্তেই সামলে নেয় নিজেকে। মুখের ওপর থেকে হাসির রেশটুকু মুছে ফেলে শান্তকণ্ঠে বললে, আপনি বুঝি স্নান করতে যাচ্ছিলেন?

ঘর ছেড়ে চলে যাবার এই প্রচ্ছন্ন অথচ স্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না অভিমন্যুর। তার ইচ্ছে ছিল সমাপ্তিকার সঙ্গে আরও একটু গল্প করে। কিন্তু এই ইঙ্গিতের পর আর বসে থাকা অভদ্রতা। শুধু তাই নয়, মেয়েটির আচার আচরণ এমনই অদ্ভুত যে এর পর হয়ত স্পষ্ট করেই তাকে চলে যেতে বলবে। তাই আর দ্বিধা না করে সে বললে, দেখেছেন, কথায় কথায় স্নানের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একদম। বলেই নিজের ঘরের উদ্দেশে পা বাড়ায় অভিমন্যু।

তারপর আরও সাতদিন কেটে গেছে। এই সাতদিনের মধ্যে হোটেলে, সমুদ্রতীরে অনেকবার দেখা হয়েছে সমাপ্তিকার সঙ্গে অভিমন্যুর। কথাবার্তাও বলেছে দু'জনে। কিন্তু সমাপ্তিকাকে যেন

কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না অভিমন্যু। ক্রমেই যেন দুর্বোধ্য ঠেকছিল এই মেয়েটিকে। এই নরম, আবার পরমুহূর্তেই গরম। তার পর আবার নরম হতেও বেশি সময় লাগে না তার। একটি বাস্তব প্রহেলিকা যেন সমাপ্তিকা।

স্ত্রী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু সমাপ্তিকার চরিত্র শুধু দুর্জ্ঞেয়ই নয়, অদ্ভুত—এক এক সময় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় অভিমন্যুর কাছে।

সমাপ্তিকাকে ভাল লাগে অভিমন্যুর। তার শিল্পী-চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সমাপ্তিকার এমন একটি রূপ যা তার বাস্তব রূপের চাইতে বহুগুণ বেশি সুষমামণ্ডিত। এমনিতেই সমাপ্তিকা অপূর্ব সুন্দরী—ইংরেজীতে যাকে বলে প্যারাগন অব্ বিউটি। কিন্তু অভিমন্যুর শিল্পী চোখের দৃষ্টিতে সেই কাল্পনিক রূপের কাছে সত্যিকারের রূপটিও তার ম্লান, নিষ্প্রভ। সমাপ্তিকার মুখের হাসি তাকে মনে করিয়ে দেয় জগদ্বিখ্যাত সেই মোনালিসার বিচিত্র হাসিটিকে। তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে সে দেখতে পায় এক চমৎকার ছন্দ। তার প্রতিটি কথাবার্তায় এক অদ্ভুত সজীবতা।

সেই প্রথম দর্শনের দিনটিতে তার ভাল লেগেছিল সমাপ্তিকাকে। মনে হয়েছিল, একেই যেন এতদিন খুঁজেছি। এর জন্যেই যেন প্রতীক্ষা করেছি এতদিন। কল্পনার রংয়ে রসে অভিষিক্ত করে যে মূর্তিকে এতদিন ধরে মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছি সে যেন এই।

কিন্তু মুখে তা' প্রকাশ করা শুধু অশোভনই নয়, অভদ্রতাও বটে। সেদিন সমুদ্রের তীরে প্রথম দর্শনের দিনটিতে মনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসকে ভদ্রতার মুখোশ এঁটে চেপে রেখেছিল অভিমন্যু। কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকেই মনে মনে সে কামনা করেছিল তার সান্নিধ্য। এই হোটেলে পাশাপাশি বাস করে সেই সান্নিধ্য লাভের চেষ্টাও যে সে করে নি তা' নয়। কিন্তু সমাপ্তিকাকে বুঝে উঠতে পারে নি মোটেই। সে যেমন হৃষ্ট মনে গ্রহণ করে নি তাকে, তেমনি ক্লিষ্ট মনে বর্জনও করে নি।

সমাপ্তিকার এই অদ্ভুত মনোভাবের কারণ জানে না অভিমন্যু।

তবে ইতিমধ্যে সে এইটুকু বুঝছে যে একটি প্রচণ্ড পুরুষ-বিদ্বেষ রোগে সে ভুগছে। তার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তা' প্রকাশ পায় মাঝে মাঝে।

সমাপ্তিকার এই মানোভাব কিন্তু ভগ্নোৎসাহ করতে পারে নি অভিমন্যুকে। দীর্ঘ প্রতীক্ষাব পর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে কাছে পেয়ে তার দোষক্রটিকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি। সে তখন কল্পলোকে ভেসে চলেছে—একটা অনাস্বাদিত আনন্দে মনটা ভরপুর তার। সেখানে মানবী সমাপ্তিকাই মুখ্য, তার দোষক্রটি একটা গৌণ ব্যাপাব মাত্র।

॥ দুই ॥

সমাপ্তিকার এই অদ্ভুত চরিত্রের কারণ জানতে হলে পেছনে তাকাতে হয়। যেতে হয় তার বাবা অভয়পদ ও মা পার্বতীর বিবাহিত জীবনের এক অসার্থক অধ্যায়ে।

পার্বতীর বাবা বরদাকান্ত চৌধুরী বনেদী জমিদার বংশের সন্তান। কিন্তু আর দশজন জমিদার সন্তানের মত মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটাতে তিনি পছন্দ করতেন না। তাই নিজের হাতে জমিদারী আসার পর তিনি ব্যবসায়ে মন দিয়েছিলেন। কলকাতায় সাত-আট খানা বাড়ীর মালিক হলেন তিনি। সেই বাড়ি ভাড়া দিয়ে প্রতিমাসে একটা মোটা অঙ্কের টাকা আয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘরের টাকা বাইরে নিয়ে গিয়ে লগ্নী করায় স্ত্রী মাতঙ্গিনীর তেমন একটা সায় ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে জমিদারি উচ্ছেদের পর মাতঙ্গিনী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামী কতবড় বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিলেন সেদিন।

বরদাকান্তের একমাত্র সন্তান পার্বতী। তেমন একটা শিক্ষিতা না হলেও রূপ-গুণে সে ছিল অদ্বিতীয়া। কিন্তু কোন পুত্র-সন্তান না

থাকায় বরদাকান্তের মনে একটা ক্ষোভ ছিল বরাবর। স্ত্রী মাতঙ্গিনীর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি দিনরাত কন্যাকে নিয়েই মশগুল থাকতেন। মাঝেমধ্যে স্বামীকে বলতেন, কী আর করবে বল? ভগবান তোমাকে একটি ছেলে দিলেন না। তবে আর একটা বিয়ে করে দেখ না? যদি তাতে ভগবান মুখ তুলে তাকান।

হাল্কাভাবে স্ত্রীর কথা উড়িয়ে দিতেন বরদাকান্ত। তাঁর বাপঠাকুর্দা একাধিক বৈধ-অবৈধ বিয়ে করলেও একাধিক স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে তিনি নিজে মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই তিনি স্ত্রী মাতঙ্গিনীর কথার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বলতেন, ভাবছি পাবিকে কোন বড় ঘরে বিয়ে না দিয়ে একটি গরীব অথচ ভদ্রঘরের ছেলেকে নিয়ে আসব ওর জন্যে। বিয়ের পর ওরা দু'টিতে আমার কাছেই থাকবে। আমাদের সংসারকেই নিজেদের সংসার বলে মনে করবে। তা'ছাড়া আমার অবর্তমানে ওরাই তো হবে আমার এই সম্পত্তির মালিক।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তিনি তেমন একটি ছেলেকে পার্বতীর জন্যে পছন্দ করতে পারলেন না। পছন্দ করলেন তাঁরই এক ধনী বন্ধুর একমাত্র পুত্র অভয়পদকে।

অভয়পদ শিক্ষিত। দেখতে শুনতে একেবারে কন্দর্পকান্তি না হলেও সুশ্রী। তা'ছাড়া স্বভাবটিও অতি নম্র। গোটাকয়েক কয়লাখনির মালিক বাপের সঙ্গে থেকেই ব্যবসা দেখাশোনা করে।

বিয়ের পর বছর দু'য়েক বেশ ভালই কাটল পার্বতীর। শ্বশুর-বাড়িতে আদর-যত্ন প্রচুর। পুত্রবধূ তাদের চোখের মণি। নিজের পরিকল্পনা সার্থক না হলেও কন্যার সুখে সুখী ছিলেন বরদাকান্ত।

ইতিমধ্যে পার্বতীর কোলে এসেছে সমাপ্তিকা, আর তারই মাস কয়েক পরে মারা গেলেন অভয়পদর বাবা।

তারপর থেকেই শুরু হল পার্বতীর জীবনের সেই গ্লানিময় অধ্যায়। কর্তৃত্ব নিজের হাতে পেয়েই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল অভয়পদ। মদে আর মেয়েমানুষে ডুবিয়ে দিলে নিজেকে। বাড়িতে থাকা খাওয়ার

কিছু ঠিক রইলো না তার। কোনদিন হয়ত গভীর রাতে বাড়ি ফেরে, আবার কোনদিন হয়ত ফেরেই না।

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন অভয়পদর বিধবা মা ছেলের আচরণে। শঙ্কিত হলেন বরদাকান্ত। অবশেষে নিরুপায় হয়ে অভয়পদর মা চলে গেলেন তাঁর ভাইয়ের বাড়ি পুত্রের সংস্রব ত্যাগ করে। আর নাতনী সমু ও কন্যা পার্বতীকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন বরদাকান্ত।

বছরখানেক চলল এভাবে। কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে এমনিভাবে পিত্রালয়ে থাকতে তেমন ভাল লাগছিল না পার্বতীর। হোক স্বামী দুশ্চরিত্র, কিন্তু তবুও তার স্বামী তো বটে! তার কাছে থেকেই তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। দূরে থেকে নয়।

কাজেই সমাপ্তিকাকে নিয়ে একদিন স্বামীর কাছে চলে গেল পার্বতী। বাপ বরদাকান্ত ও মা মাতঙ্গিনীর এতে তেমন সায় না থাকলেও বাধা দিলেন না তাঁরা।

ভুল বুঝেছিল পার্বতী। সে ভেবেছিল প্রেমভক্তির জোয়ারে অভয়পদর চরিত্র-নৌকোর মুখ সে ঘুরিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হল ঠিক উল্টো। অভয়পদ পার্বতীর ব্যবহারকে দুর্বলতা মনে করে তাকে আমলই দিলে না। অসংযমের রাশ পুরোপুরি ছেড়ে দিলে সে।

পার্বতী চিরকালের একটু ভীরু স্বভাবের নারী। তার মনে স্বামীর প্রতি ভালবাসা অফুরন্ত, নিষ্ঠাও প্রচুর। কিন্তু অভাব দৃঢ়তার। শত অত্যাচার শত লাঞ্ছনাতেও সে প্রতিবাদ করতে পারত না। কেবল কন্যা সমুকে বুকে চেপে একা একা চোখের জল ফেলত।

ধীরে ধীরে ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হল অভয়পদ। দেনার দায়ে জলের দামে বেচে দিল কয়লাখনিগুলো একের পর এক। তারপর এসে পথে দাঁড়াল। সমুর বয়স তখন বছর সাতেক।

এই অল্পবয়সেই কিন্তু সমাপ্তিকা বুঝতে শিখেছিল অনেক কিছু। সংসারের আবহাওয়া বুঝতে বাধ্য করেছিল তাকে।

গভীর রাতে এক-একদিন ঘুম ভেঙে যেত তার। শুনতে পেত অভয়পদর কদর্য চিৎকার। সেই মাঝরাতে মত্ত অবস্থায় পার্বতীকে প্রহারও করত অভয়পদ। গুমরে গুমরে কাঁদত পার্বতী, আর অনুনয়-বিনয় করত তাকে। কিন্তু তাতে মোটেই শান্ত হত না অভয়পদ। কুৎসিত গালাগাল দিয়ে সে স্ত্রীকে বলত, ইঃ, আবার ভক্তি দেখ না! যদি পার তো বাপের বাড়ির সেই হাড়কিপ্‌টে বুড়োটার কাছ থেকে হাজার কয়েক টাকা এনে দাও তো আমায়। তবেই না বুঝব স্বামীভক্তি। তা' নয়, কেবল ছিঁচ্‌কাঁদুনের মত রাতদিন ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করে কান্না!

কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলত পার্বতী, ওগো তুমি এমনি করে আর কষ্ট দিও না আমাকে। একটু ভাল হও তুমি। আর দশজনের মত ভাল হয়ে চলতে শেখ। আর বাবার টাকার কথা বলছ? তাঁদের আমি ছাড়া আর কে আছে বল? তাঁদের অবর্তমানে তো সবকিছু তোমার হাতেই আসবে। তুমি কেবল—।

পার্বতীর কথা শেষ না হতেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠত অভয়পদ, আরে রেখে দাও তোমার বাপের সম্পত্তি। কবে সেই বুড়ো পটল তুলবে, সেই আশাতেই আমি এখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব! ওসব কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না চাঁদ। বলেই হি-হি করে কদর্য হাসি হাসতে হাসতে আবার বলত, আগে নগদ কিছু আনো, তারপর অন্য কথা।

কিন্তু পার্বতীর আত্মসম্মান জ্ঞান প্রচণ্ড। মরে গেলেও সে মাতাল স্বামীর জন্যে ধনী পিতার কাছে হাত পাততে পারবে না। তাই পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইলো না তার।

সব কথাই কানে যেত ছোট সমাপ্তিকার। তার কিছু বুঝত, কিছু বুঝত না। কিন্তু যতটুকু বুঝত তাতেই ঐ বয়সে পিতার উপর একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল তার। এক একদিন মায়ের কান্না সহ্য করতে না পেরে নিজেই বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে

শুয়ে কাঁদত। আবার কোনদিন হয়ত ভাবতো, সে যদি বড় হত তো ছুটে গিয়ে মায়ের ওপর অত্যাচারের সমুচিত শিক্ষা দিত তার বাবাকে।

বাপকে কোনদিনই ভালবাসতে পারে নি সমাপ্তিকা। তার বদলে তার ওপর সেই বিরূপ মনোভাবের অঙ্কুরটিই ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল। এক-এক সময় মায়ের ওপরও রাগ হত। বাবা তার ওপর এত অত্যাচার করে তবুও কেন সে ভেবে মরে তার জন্যে? যেদিন হয়ত অভয়পদ বাড়ি ফেরে না সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে সে লক্ষ্য করে তার মা বিছানায় নেই। জানালার গরাদ ধরে অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। দু'চোখে তার জল।

সমাপ্তিকার এসব ভাল লাগে না। বাবা যখন আজ বাড়ি এসে মাকে মারধোর করলে না তখন কেন শুধু শুধু জেগে বসে থেকে চোখের জল ফেলা? কেন তার মা এখনও ভক্তি করে তাকে? কেন চিন্তা করে, ভাবনা করে তার জন্যে?

মাঝে মাঝে সমাপ্তিকার মনে হত, তার বাবা যদি পাশের বাড়ির খনার বাবার মত হঠাৎ মরে যায় তো খুব ভাল হয়। মাকে আর কষ্ট দিতে পারবে না একটুও। এমনকি খনার মত বাপের জন্যে সে একটুও কাঁদবে না। একফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।

কিন্তু চোখের জল ফেলেছিল সমাপ্তিকা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লিভার পচে গিয়ে যেদিন অকস্মাৎ মারা গেল অভয়পদ, সেদিন স্বামীর মৃতদেহটা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল পার্বতী। সেদিন কিন্তু সমাপ্তিকাও কেঁদেছিল। কিন্তু সেই কান্না মৃত অভয়পদর জন্যে অথবা মা পার্বতীর দুঃখে তা' বলা কঠিন।

বাপের মৃত্যুর পর সমাপ্তিকা পার্বতীর সঙ্গে চলে এসেছিল দাদুর কাছে। বরদাকান্তও সস্নেহে নাতনীকে টেনে নিয়েছিলেন নিজের কাছে।

দাদুর স্নেহের ছায়ায় বড় হতে থাকলেও অত্যাচারী বাপের কথা

কিন্তু কোনদিনই ভুলতে পারে নি সমাপ্তিকা। ছোটবেলার সেই ভয়ঙ্কর রাতগুলোর কথা মনে হলে এখনও সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। তার ছেলেবেলার শিশুমনে বাপকে অত্যাচারীরূপে চিহ্নিত করে যে রেখাপাত ঘটেছিল, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রেখা অস্পষ্ট হতে হতে একসময় অদৃশ্য হয়ে না গিয়ে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠল, ধীরে ধীরে। বাপ অভয়পদ হয়ে উঠল পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি—নির্মম, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর। আর সমগ্র নারীজাতির প্রতিনিধি তার মা পার্বতী —অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা, অবহেলিতা। দাদু বরদাকান্তের স্নেহের ছায়ায় মানুষ হয়েও পুরুষ সমাজের ওপর তার সেই অদ্ভুত ধারণার কোনই পরিবর্তন হল না। বরঞ্চ কোন অসতর্ক মুহূর্তে দাদুর নিজের কথার মধ্যেই সে সমর্থন পেত তার এই ধারণার।

সমাপ্তিকাকে খুবই স্নেহ করতেন বরদাকান্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি আক্ষেপ করতেন স্ত্রী মাতঙ্গিনীর কাছে, নিজেরও একটা ছেলে হল না। আর পাবিরও হল একটা মেয়ে। সমু যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হত তো—।

এমনি ধরনের একটা কথা একদিন বরদাকান্তের মুখে শুনতে পেয়েছিল সমাপ্তিকা। সেদিনই তার মনে হয়েছিল, মুখে যতই বলুন আসলে সে নিজে মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে তার দাদু অসন্তুষ্ট। এমনি দু-একটা সাধারণ কথা অসাধারণ হয়ে উঠে নিজের অভিমতকে আরও দৃঢ় করেছিল সমাপ্তিকার। এমন কি দিদিমা মাতঙ্গিনীর সঙ্গে দাদুর ছোটখাট সাধারণ কথা কাটাকাটিকেও সে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

যতই দিন যেতে থাকে ততই পুরুষ-বিদ্বেষ বাড়তে থাকে তার। পুরুষের ছায়া মাড়াতেও তার ভাল লাগে না। মেয়েস্কুলে পড়া শেষ করে মেয়ে-কলেজে ভর্তি হ'ল সমাপ্তিকা। পুরুষ সম্বন্ধে তার এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কথা বাড়িতে মুখ ফুটে কাউকে কোনদিন না বললেও কথাবার্তায় মাঝেমধ্যে বেরিয়ে পড়ত। শুনে, গম্ভীর হয়ে থাকতেন

বরদাকান্ত, আতঙ্কিত হয়ে উঠত পার্বতী আর কৌতুক বোধ করতেন তার দিদিমা মাতঙ্গিনী।

একদিন হঠাৎ করোনারী থ্রম্বসিসের প্রথম স্ট্রোকেই মারা গেলেন বরদাকান্ত। এবার বাড়িতে রইল মাত্র তিনটি স্ত্রীলোক। দিদিমা মাতঙ্গিনী চিরকালের রসিকা। জমিদার পুত্রবধূ মাতঙ্গিনী চিরদিন হেসে-খেলে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর নিজের সংসারেও কোন দায়িত্বই নিজের কাঁধে রাখেন নি কোনদিন। সংসারের ঝড়-ঝাপটার অধিকাংশই সহ্য করতে হয়েছিল বরদাকান্তকে। তাই তাঁর অবর্তমানে দিশেহারা হয়ে পড়লেন মাতঙ্গিনী। মা পার্বতী বরাবর শান্তপ্রকৃতির। কথা বলেন কম, ভাবেন বেশি। তাই সবদিকে তুখোড় চৌকস কলেজে পড়া মেয়ে সমাপ্তিকাকেই সংসারের হাল ধরতে হ'ল। প্রয়োজনমত উকিল বাড়ি যাতায়াত, ভাড়ার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হ'ল তাকে। এককথায়, তিনটি স্ত্রীলোকের এই ছোট্ট সংসারের কর্ত্রী হয়ে উঠল সমাপ্তিকা।

কিন্তু কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে প্রথমেই সমাপ্তিকা যে কাজটি করতে উদ্যত হ'ল তাতে তেমন সায় দিতে পারে নি তার মা, দিদিমা। রাজু এ সংসারের অনেকদিনের চাকর। বয়স হলেও কর্মক্ষমতা তখনও তার অটুট। সেই রাজুকে সমাপ্তিকা রাতারাতি ছাড়িয়ে দিয়ে তার স্থলে নিয়োগ করলে একটি স্ত্রীলোককে।

রাজু এসে কেঁদে পড়েছিল মাতঙ্গিনীর কাছে, দিদিমণি আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন। এই বয়সে আর কোথায় যাব মা?

শুনে, পার্বতীও রেগে উঠেছিলেন মেয়ের ওপর। মাতঙ্গিনীকে বলেছিলেন, সমু আজকাল বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, মা।

সমাপ্তিকা কলেজ থেকে ফিরতেই মাতঙ্গিনী পরিহাসতরল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন তাকে, আর কারুর সঙ্গে পেরে না উঠে শেষে ঐ বুড়ো রাজুটার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলি, সমু?

—সে কি, দিদিমা? আমি তো ওর ভালর জন্যেই ওকে ছাড়িয়ে দিলুম।

গম্ভীর কণ্ঠে পার্বতী বলেছিলেন, হ্যাঁ, ভালর জন্যেই বটে। বুড়োবয়সে না খেতে পেয়ে মরাটাই ওর পক্ষে ভাল, তাই না?

—কী বলছ তুমি মা, রাজুদা না খেতে পেয়ে মরবে? জান তুমি দেশে ওর কী পরিমাণ জমিজমা আছে? তা'ছাড়া এতদিন এ-বাড়িতে কাজ করল, ওর জন্যে মাসে মাসে একটা মাসোহারার ব্যবস্থাও করেছি আমি।, দেশে গিয়ে ও তো সুখেই থাকবে। বুড়ো হয়েছে, এখন ওর তো বিশ্রামেরও প্রয়োজন।

অকাট্য যুক্তি। এ যুক্তি খণ্ডন করার সাধ্য অন্য দুটি স্ত্রীলোকের ছিল না। কাজেই রাজুকে দেশেই চলে যেতে হল।

এর পরে সমাপ্তিকা ছাড়িয়ে দিলে তাদের ড্রাইভার ছট্টু সিং-কে। কিন্তু এবারে বিপদে পড়ল সমাপ্তিকা নিজেই। এদেশে মেয়ে ড্রাইভার পাওয়া যায় না। এদিকে গাড়ির প্রয়োজন সমাপ্তিকারই বেশি। মা, দিদিমা মাঝে মধ্যে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর ছাড়া আর বিশেষ কোথাও যান না। কাজেই মহাবিপদে পড়ল সমাপ্তিকা। মেয়ে ড্রাইভারের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েও কিছু ফল হল না। অগত্যা নিজেকেই মোটর চালনা শিখতে হ'ল। লারনার লাইসেন্সের বদলে সমাপ্তিকা যেদিন পাকা মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরল সেদিন মাতঙ্গিনী বলে উঠেছিলেন, ধন্যি মেয়ের জেদ! সেকালে পরশুরাম দেশটাকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, আর একালে আমাদের সমু দেশটাকে নিঃপুরুষ না করে ছাড়বে না দেখছি।

পার্বতী কিন্তু কোন কথা না বলে একবার মাত্র মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তির্যক চোখে।

নারী-বিদ্বেষী পুরুষের খোঁজ পাওয়া গেলেও পুরুষ-বিদ্বেষী নারীর খবর সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই সমাপ্তিকার এই পুরুষ-বিদ্বেষী মনোভাবকে নিয়ে কলেজে মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই হাসি-ঠাট্টা চলত।

কেউ কেউ বলত, আরে ওসব কিছু না। ক্যামোফ্লেজ—বহিরাবরণ মাত্র। আসলে মনে মনে এরা অতিরিক্ত পুরুষ ঘেঁসা। মনের এই অবস্থাটাকে লুকোতে গিয়েই ওদের ঐ অবস্থা। কেউ কেউ আবার মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড্‌কে কোট্‌ করে এই যুক্তির সার্থকতা প্রমাণ করতে চাইত।

সমাপ্তিকা কিন্তু সহপাঠিনীদের এই সমস্ত মন্তব্যে তেমন একটা কান দিত না। নিজের মতামতে তার দৃঢ় বিশ্বাস। কলেজে সবিতা, ছন্দা ও অঞ্জলির সঙ্গেই তার হৃদ্যতা ছিল বেশি। তারা সমাপ্তিকাকেই সমর্থন করত সবসময়। তাই যা কিছু কথাবার্তা, যা কিছু আলোচনা সে করত এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে। কলেজের চারটি মেয়ের এই দলটিকে অন্য মেয়েরা ঠাট্টা করে বলত—ম্যান হান্টিং গ্রুপ অর্থাৎ নর-শিকারীর দল। এই 'নর-শিকারী' শব্দটি উভয় অর্থেই প্রযোজ্য।

নর-শিকারী দলই বটে। একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে এই দলটির পিছু নিয়েছিল গুটিকয়েক কাপ্তেন গোছের ছোক্‌রা। সেদিন কলেজে গাড়ি নিয়ে আসে নি সমাপ্তিকা। তাই সেও ছিল তাদের মধ্যে।

মনের আনন্দে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে করতে তাদের পিছু পিছু চলছিল সেই কাপ্তেনরা।

অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়াল সমাপ্তিকা। তার সেই আগুনের মত রূপ নিয়ে ছুটে এসে একটি ছোক্‌রার জামার কলার চেপে ধরতেই কাপ্তেনরা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এ-রকম একটা অবস্থার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না তারা। ইতিমধ্যে অন্য মেয়ে তিনটিও এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল রাস্তায়। ছোকরা ক'টি তখন পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু পালাবারও পথ নেই। জনতা ঘিরে ধরেছে তাদের ততক্ষণে। সেদিন সমাপ্তিকা সেই জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা না করলে জনতার রোষে কাপ্তেনদের কাপ্তেনী ঘুচে যেত। অবশেষে হাতজোড় করে মেয়েদের কাছে ক্ষমা চেয়ে পরিত্রাণ পেয়েছিল তারা।

ঘটনার কথা শুনে মা পার্বতী বলেছিলেন, ছি-ছি, কী লজ্জা! রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধাতে তোর লজ্জা করল না? দিন দিন তুই কী হচ্ছিস বল্ তো!

দিদিমা মাতঙ্গিনী কিন্তু হেসে একেবারে লুটোপুটি। বলেছিলেন, ধন্য হয়ে গেল ছোক্‌রা। এমন রূপসী মেয়ের হাতের কলার ধরে ঝাঁকুনি খাওয়াও যে কত সুখের তার তুই কী জানবি রে সমু?

চোখ পাকিয়ে বলেছিল সমাপ্তিকা, যাও, তোমার কেবল সব তাতেই ঠাট্টা!

॥ তিন ॥

পুরাণে আছে, বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে নিজের কমণ্ডলুতে রেখেছিলেন পিতামহ ব্রহ্মা। কমণ্ডলুর ঐ অপরিসর স্থানটুকুতেই সেদিন গঙ্গা নিজের জায়গাটুকু করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়তে বাড়তে যেদিন তিনি কমণ্ডলু ছাপিয়ে পড়লেন, সেদিন তার সামনে ঐরাবত পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল।

কলেজের সেরা ছাত্র অভিমন্যুর জীবনেও যে কোনদিন কোন নারীর আবির্ভাব ঘটে নি তা নয়। এসেছিল অনেকেই, কিন্তু বিরস-মুখে সবাইকেই বিদায় নিতে হয়েছিল। কেউ বলেছে—অহঙ্কারী। কেউ বা বলেছে—একেবারে রসকষহীন। কিন্তু তার আসল মনের খোঁজ পায় নি কেউই। মনটা তখন তার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এমন একটি নারীর জন্যে বাস্তবে যার দেখা কোনদিনই পায় নি অভিমন্যু। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত, কল্পনা ও বাস্তবের ফারাক চিরকালের। তাই তোকে সারাজীবনই এমনিভাবে ঘুরে মরতে হবে।

জবাব না দিয়ে অভিমন্যু মৃদু হেসেছিল সেদিন। মনে মনে বলেছিল, ক্ষতি কী? সারা-জীবনটাই তার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজী। তবুও আশায় থাকব, একদিন হয়ত পেলেও পেতে পারি তাকে।

তাই কৃপণের ধনের মত মনের সবটুকু ঐশ্বর্য সে তুলে রেখেছিল সেই অনাগত ভবিষ্যতের কল্পলোকের মানসীর জন্যে। মনের এক ছোট্ট কোণে তিলে তিলে সে শুধু জমাই করে গিয়েছিল। খরচের খাতা ছিল সম্পূর্ণ শূন্য।

অবশেষে সত্যি সত্যি যেদিন এক শীতের সন্ধ্যায় সমুদ্রের তীরে সেই বাঞ্ছিত নারীর আবির্ভাব ঘটল, সেদিন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল মনটা। মনের সেই ছোট্ট অপরিসর কোণে যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না সেই ঐশ্বর্যের প্রকাশকে। মনে হচ্ছিল সবকিছু ছাপিয়ে তা' ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই আকাঙ্ক্ষিত নারীকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা' ঘটল না। সমাপ্তিকাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, তাকে একচুল নড়াতে পর্যন্ত সক্ষম হল না অভিমন্যু—অন্ততঃ চাল-চলন কিম্বা কথা-বার্তার মাধ্যমে তেমন কিছুই প্রকাশ করে নি সমাপ্তিকা।

একটু দমে গিয়েছিল অভিমন্যু। জীবনে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ফাঁক থাকে সেই তত্ত্ব অজানা ছিল না তাব। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নিয়ে তার মানসপ্রতিমা যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন তার অদ্ভুত ব্যবহার সেই ফাঁকটুকুকে শত যোজন বিস্তৃত করে দিল। আশাহত অভিমন্যুর পক্ষে তখন নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন পথ রইল না।

চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যের ছিদ্র-পথেই একদিন অভিমন্যু সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আস্তানা নিয়েছিল পুরীর এই হোটেলে। বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ও দুর্দান্ত রাগী অভিমন্যুর বাবা সেদিন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন অভিমন্যুর মাকে, ছেলের হয়ে তুমি ওকালতি করতে এসেছ আমার কাছে? ওর মত একটা অপদার্থের ভাগ্য ভাল যে এমন একটি পাত্রী জোগাড় করতে পেরেছি। কী গুণ আছে তোমার ছেলের? ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ফার্স্ট হয়েছে, এই গুণ? কিন্তু যে ছেলে সেই বিদ্যাকে কাজে না লাগিয়ে, বাপের একটা এস্‌টাব্‌লিশড ফার্মকে এতটুকু সাহায্য না করে দিনরাত কেবল ঘুরে বেড়ায়

আর ছবি আঁকে তার ঐ ফার্স্ট হওয়ার কতটুকু দাম আছে বলতে পার?

স্বামীর কথায় জবাব দিতে পারেন নি অভিমন্যুর মা সেদিন। একবর্ণও মিথ্যে বলেন নি তাঁর স্বামী। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করে বলেছিলেন, কিন্তু বিয়ে করবে না একথা অভি কখনও তো বলেনি। বলেছিল কেবল আরও কিছুদিন দেরি করতে—।

—না, তা' হয় না, বিয়ে তাকে এখনই করতে হবে। এবং তা' আমার মনোনীত পাত্রীকেই। বলেই পুরু লেন্সের চশমাটা চোখে লাগিয়ে টেবিলের ওপর বিস্তৃত একটা কোটি টাকার কন্‌স্ট্রাক্‌শনের ব্লু প্রিন্টের ওপর আবার নজর দিয়েছিলেন তিনি।

আর সেই দিন শেষ রাতেই কাউকে কিছু না জানিয়ে পুরীর উদ্দেশে রওনা হয়েছিল অভিমন্যু। কেবল মা'র বালিশের তলায় একটা চিরকুট রেখে এসেছিল। তাতে লিখেছিল—মা, আমি চললাম। বাবার রাগ পড়লেই আবার আসবো।

অভিমন্যুর প্রতি একই সময় আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মত একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে দিন কাটে সমাপ্তিকার। রাত জেগে নিজের ঘরে বসে অভিমন্যুর বেহালার সুর শোনে। শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আবার শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ কেমন তার দুর্বলতা? সে কি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল, নাকি একেই বলে ভালবাসা! ছি-ছি, এ কী অবস্থা হয়েছে তার? কোন্ যাদুমন্ত্রে মনের সেই পুরুষ-বিদ্বেষের ভাবটা এমন নিস্তেজ হয়ে আসছে? নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে পড়ে সমাপ্তিকা। না-না, এ জিনিসকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। কিছুতেই নয়। প্রয়োজন হলে সে ফিরেই যাবে কলকাতায়।

মনের সঙ্কল্প কিন্তু মনেই থেকে যায় সমাপ্তিকার। পুরী ছেড়ে এখনই চলে যেতে যেন মনটা ঠিক সায় দেয় না। কিসের এক অদৃশ্য বন্ধন যেন বেঁধে ফেলেছে তাকে এখানে।

নিজেকে সংযত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে সমাপ্তিকা। এখনও সে একা একাই বেড়ায় সমুদ্রের পাড়ে। অভিমন্যুর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মনের আলোড়নটুকু সযত্নে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে একটা ছদ্ম গাম্ভীর্যের আড়ালে।

সেদিন শীত একটু কম। সমুদ্রের হাওয়ার কন্‌কনে ভাবটাও যেন কম অনেকটা। তাই ছবি আঁকা শেষ করে সেখানেই বালির ওপর খানিক্ষণ বসেছিল অভিমন্যু। অবশেষে একসময় আঁকাব সরঞ্জাম গুটিয়ে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে ফিরছিল হোটেলের দিকে।

অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। লোকজন চোখে পড়ছে না এদিকটায়। অকস্মাৎ পেছনে একটা শঙ্কিত নারী কণ্ঠের আহ্বানে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে অভিমন্যু। পরিচিত কণ্ঠস্বর।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতেই অভিমন্যুর নজর পড়ে সমাপ্তিকার ওপর। একরকম ছুটতে ছুটতেই সে আসছিল তার দিকে।

দু'পা এগিয়ে যায় অভিমন্যু। সমাপ্তিকা ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে অভিমন্যু প্রশ্ন করে, এ কী, এভাবে আসছেন কেন? কী হয়েছে?

অভিমন্যুর একেবারে গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ায় সমাপ্তিকা। উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে সে তখনও হাঁপাচ্ছে। চোখেমুখে সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ তার। ঠোঁট দুটো তখনও কাঁপছে।

অভিমন্যু আবার প্রশ্ন করে, কী হল আপনার?

একবার পেছন ফিরে তাকায় সমাপ্তিকা। ভয়ে শুকিয়ে-ওঠা কণ্ঠে সে বললে, একটা লোক—ভয়ানক দেখতে—আমাকে তাড়া করেছিল—।

ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে অভিমন্যুর। বললে, তাই নাকি? কই চলুন তো, একবার দেখি। বলেই এক পা এগিয়ে যেতেই তার হাতটা চেপে ধরে সমাপ্তিকা। না-না। আমি যাব না। আমি যেতে পারব না কিছুতেই।

একমুহূর্তে কি যেন চিন্তা করে অভিমন্যু। তারপর আবার বললে, বেশ, তবে দরকার নেই গিয়ে। হোটেলেই চলুন তা'হলে।

যেতে যেতে অভিমন্যু আবার বললে, আপনাকে তো আমি অনেকবার বলেছি, এমনি নির্জন জায়গায় সন্ধ্যার পর আপনার পক্ষে একা চলাফেরা করা ঠিক নয়।

কথার জবাব দেয় না সমাপ্তিকা।

তারপর দু'দিন সমাপ্তিকা হোটেল ছেড়ে বের হল না। বিকেলের দিকে কেবল হোটেলের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েই সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ করলো। কিন্তু মন ভরে না তাতে। এখানে এসে এমনি ঘরে আট্কে থাকতে কার ভাল লাগে?

অবশেষে একদিন বলেই ফেললো কথাটা অভিমন্যুকে। জবাব দিতে গিয়ে একটু সময় দ্বিধা করেছিল অভিমন্যু। তারপর বলেছিল, বেশ তো এতে আর আপত্তি কিসের?

সেই দিন থেকেই বিকেলে অভিমন্যুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে আরম্ভ করল সমাপ্তিকা।

আরও দিন সাতেক কেটে গেছে তারপর। এই সাতদিনে অভিমন্যু ও সমাপ্তিকা একে অন্যের আরও কাছে এসেছে। কিন্তু তবুও যেন একটা দ্বিধা সমাপ্তিকার মনে। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ।

অভিমন্যু একদিন বলেই ফেলেছিল, আপনার এই রূপ যদি তুলি কাগজের মাধ্যমে ধরে রাখতে পারতাম তা'হলে হয়ত মোনালিসার মধ্যে লিওনার্দ-দ্য-ভিঞ্চির মত আপনার মধ্যেই অমর হয়ে থাকতাম আমি।

নিজের রূপের প্রশংসা এমন কিছু নতুন নয় সমাপ্তিকার কাছে। জন্ম থেকেই এই প্রশংসা শুনতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে সমুদ্রের এই নির্জন পাড়ে বেড়াতে বেড়াতে অভিমন্যুর কণ্ঠে এই প্রশস্তির মধ্যে কেমন যেন একটা নতুনত্বের স্বাদ পায় সে। কিন্তু

তার চেয়েও বড় হয়ে যে কথাটা তার কানে বাজতে থাকে সেটা হচ্ছে অভিমন্যুর কথার শেষের অংশটুকু—আপনার মধ্যেই অমর হয়ে থাকতাম আমি।

সেই মুহূর্তে সমাপ্তিকার মনে একটা সুপ্ত বাসনার ক্ষণিক উদ্বোধন ঘটে যায় প্রায় নিজের অজান্তে। উদ্‌ভ্রান্ত-বিহ্বল হয়ে ওঠে মনটা। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত একটা আত্মবিস্তৃতির অনুভূতি ডানা মেলে উড়তে উড়তে সুরের লহরী তোলে তার মনের আকাশে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই ডানা দুটোকে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরে সমাপ্তিকা। সংযত করে নিজেকে। তারপর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললে, আমাকে মডেল করে আমার ছবি আঁকতে চান বুঝি ?

—না—না। ওসব কথা ভাবছি না মোটেই। আমি কেবল সুন্দরের প্রশংসা করছি।

কোন জবাব দেয় না সমাপ্তিকা। কেবল তার গোলাপের পাপড়ির মত পাতলা ঠোঁটের কোণে জেগে ওঠে এমন একটু হাসি যা আর যাই হোক্ না কেন, আনন্দের অভিব্যক্তি নয় মোটেই।

অভিমন্যুর নজর এড়ায় না সেই হাসিটুকু। সাগরে ডুবে যাওয়া সূর্যের শেষ রশ্মির আলোয় আলোকিত সমাপ্তিকার সেই বিচিত্র হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে অভিমন্যু আবার প্রশ্ন করে, অমন করে হাসছেন যে।

—একটা কথা মনে করে হাসি পেল।

—কী কথা ?

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় সমাপ্তিকা, আপনারা অর্থাৎ পুরুষেরা বুদ্ধিমান, আর মেয়েরা একেবারেই বোকা। তাই তাদের বোকামির সুযোগ নিয়ে রূপ-গুণের স্তব-স্তুতির মাধ্যমে তাদের অভিভূত করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন আপনারা।

এ-ধরণের একটা রূঢ় জবাবের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না অভিমন্যু। নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসার এমন একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা যে

কোন নারী দিতে পারে তা ছিল তার নিজেরই ধারণার বাইরে। কিন্তু সমাপ্তিকার মত একটি মেয়ের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। তাই অভিমন্যু আবার বললে, সে কি, সুন্দরকে সুন্দর বলব না? মানুষের সৌন্দর্য-বোধ আছে বলেই না ফুলের এত সৌন্দর্য।

—তা'হলে কি আপনি বলতে চান পুরুষের সৌন্দর্যবোধ আছে বলেই মেয়েদের সৌন্দর্য?

—নিশ্চয়—একশোবার। তাই তৃণভোজী জীবের কাছে ফুলে আর পাতায় কোন প্রভেদ নেই। মাংসাশী জীবের কাছে নেই স্ত্রী-পুরুষের সৌন্দর্যের প্রভেদ। বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দেয় অভিমন্যু।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পথ চলতে চলতে একসময় বললে সমাপ্তিকা, কিন্তু আমি যদি বলি পৃথিবীতে পুরুষের অস্তিত্ব না থাকলেও মেয়েদের রূপের কোন হানি হত না?

মৃদুহেসে এবার জবাব দেয় অভিমন্যু, তা'হলে মেয়েদের সেই রূপ উপভোগ করতো কে?

—কেন, মেয়েরা নিজেরা!

—অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। মেয়েদের রূপের আসল সমঝদার পুরুষেরা। মেয়েরা কিছুতেই নয়।

—কিন্তু হিমালয়ের দুর্গম অরণ্যে প্রকৃতির কোলে নাকি আছে অজস্র ফুলের সমারোহ। সেই ফুলের সৌন্দর্য নাকি মানুষের কল্পনাতীত। সেখানে কোনদিনই কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে নি। তাই বলে কি বলতে চান, সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য একেবারেই অর্থহীন? বলেই মৃদু-মৃদু হাসতে থাকে সমাপ্তিকা।

—এবার কিন্তু আপনি দর্শনতত্ত্বের মধ্যে এসে গেলেন। তাই আমার পক্ষে জবাব দেওয়া শক্ত। বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। দর্শনের কিছুই বুঝি না। কথাটা বলে একটু জোরেই হেসে ওঠে অভিমন্যু।

সেদিন সূর্য অস্ত যেতেই একখানা গাঢ় কালো রংয়ের আবরণ ঢেকে ফেলেছিল গোধূলিকে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ। বাতাসে

বন্যতার উন্মাদনা। বোধ হয় অসময়ে ঝড় উঠবে। সমুদ্রের জল কষ্টি-পাথরের মত কালো। সেই বিস্তীর্ণ কালোর মধ্যে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে সাদা ফেনার মুকুট। আবার মিলিয়ে যায় পরক্ষণেই। ঢেউয়ের একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

একটু জোরেই হোটেলের দিকে পা চালাচ্ছিল অভিমন্যু ও সমাপ্তিকা। অভিমন্যুর নজর ছিল সমুদ্রের দিকে। অশান্ত প্রকৃতির সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য মনে মনে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছিল সে।

অকস্মাৎ একটা ভয়ার্ত শব্দ করে উঠল সমাপ্তিকা। অভিমন্যুর একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ত্রস্তকণ্ঠে সে বলে ওঠে—ঐ—ঐ সেই লোকটা—আবার আসছে—।

সমাপ্তিকার একটা হাত শক্তহাতে চেপে ধরে অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অভিমন্যু।

মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গোঁফ-দাড়িতে আচ্ছাদিত মুখে একটা বিকট হাসি। গায়ে একটা লম্বা আলখাল্লা কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু এবং হাতে একখানা লাঠি নিয়ে সেই ভয়ানক দর্শন লোকটা অন্ধকারের বুক চিরে তাদের সামনে এসে হাজির হয় সাক্ষাৎ যমদূতের মত।

অভিমন্যুর শক্ত হাতের মধ্যেও থর থর করে কাঁপছিল সমাপ্তিকার হাতখানা। মুখে আর কথা সরছিল না তার।

হঠাৎ হো-হো শব্দে হেসে ওঠে অভিমন্যু। তারপর সমাপ্তিকার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, এই লোকটাই সেদিন তাড়া করেছিল আপনাকে? একে দেখেই সেদিন ভয় পেয়েছিলেন?

অভিমন্যু পকেট থেকে একটা দশ পয়সা বের করে লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিতেই লোকটা হুমড়ি খেয়ে বালির মধ্য থেকে হাতড়ে তুলে নেয় সেটা। অভিমন্যু এবার একটা ধমক্ দেয় তাকে, যাঃ, পালা শীগ্‌গির এখান থেকে।

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় লোকটা অন্ধকারের মধ্যে। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে অভিমন্যু বললে, লোকটা পাগল। ভিক্ষে করে

বেড়ায়। পয়সা না দিলে পিছু পিছু ছোটে। একটু থেমে সমাপ্তিকার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, সেদিন বোধহয় পয়সার জন্যেই লোকটা ছুটেছিল আপনার পিছু পিছু। আর আপনি বোধ হয় ভেবেছিলেন অন্য কিছু।

ভয় কেটে গিয়ে বিস্ময়। আবার বিস্ময় কেটে গিয়ে লজ্জা। এতক্ষণে একটা প্রচণ্ড লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে সমাপ্তিকা। ছি-ছি, এই পাগল-টাকে দেখেই সে এত ভয় পেয়েছিল! আর এই জন্যেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়েছিল অভিমন্যুর কাছে। ওর কাছে আজ প্রমাণ হয়ে গেল, মুখেই তার যতকিছু বড়াই। আসলে সে এক নম্বর ভীতু।

এবার লজ্জার ভাবটা কেটে গিয়ে সেখানে দেখা দেয় ক্রোধ, প্রথমে নিজের ও শেষে অভিমন্যুর ওপর। যার কাছে সে আজ এমনিভাবে খেলো হয়ে গেল তার কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও তারই ওপর এসে জমা হয় সেই ক্রোধ।

রাগতস্বরে সমাপ্তিকা শুধু বললে, হয়েছে, এবার হোটেলে চলুন।

রাগটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না সমাপ্তিকার। পরের দিন বিকেলে অভিমন্যুর বেড়াতে যাওয়ার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না সে।

সেদিন একটু আগেই বেড়াতে বেরিয়েছিল তারা। সমুদ্রের তীরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এসে পড়েছিল। আগের দিনের আলোচনার জের টেনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়টিই ছিল তাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। বলছিল সমাপ্তিকা, যতই কেন না যুক্তি দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করুন, একথা আপনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না যে আপনারা পুরুষেরা অত্যন্ত স্বার্থপর। যা কিছুই আপনারা করুন না কেন, তার পেছনে থাকে আপনাদের নিজেদের স্বার্থ।

—স্ত্রী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কটাকেও কি আপনি এই দৃষ্টিতে বিচার করেন?

—নিশ্চয়। চিরন্তন সম্পর্ক, জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক প্রভৃতি গালভরা

কথাগুলো শুনতে অবশ্যি আমাদের ভালই লাগে। কিন্তু আসলে ওগুলো হচ্ছে স্ত্রীজাতিকে নিজেদেব তাঁবে রেখে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবার মন্ত্র।

—তাই যদি হবে, তবে স্ত্রীজাতি সেই বাঁধনে বাঁধা পড়ে কেন? আসলে পুরুষের কর্তৃত্বের মধ্যে থেকে শান্তিতে জীবনধারণ করার আকাঙ্ক্ষাটা তাদের সহজাত—

—সহজাত কথাটা বলা উচিত নয় আপনার। আপনারা পুরুষেরাই তৈরি করেছেন সমাজ ব্যবস্থা। আর বাধ্য করেছেন নারীকে সেই ব্যবস্থা মেনে নিতে। উপায় নেই বলে তারাও মেনে নিয়েছে সেই ব্যবস্থা। কিন্তু চিরদিনই নারীর এমনি অবস্থা ছিল না। ম্যাট্রিয়ারক্যাল সোসাইটিতে নারীই ছিল প্রধান। সন্তানের পরিচর হ'ত মায়ের নামে। মায়েরাই ছিল সেদিন সংসারের কর্ত্রী। তাদের হুকুমেই সেদিন গঠিত হয়েছিল তখনকার সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু ধীরে ধীরে পাল্টে গেল সবকিছু। এল প্যাট্রিয়ারক্যাল সমাজ ব্যবস্থা। আরম্ভ হ'ল তাদের দুর্দশা—।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি এটাকে নারীর দুর্দশা বলছেন কেন?

—বলব না কেন? আপনাদের হুকুমের চাকর তারা। বিনে মাইনের দাসী-বাঁদী। আপনাদের তুষ্টিতেই তাদের তুষ্টি। নইলে সংসারে অনর্থ ঘটাবেন আপনারা, কারণ চাবিকাঠিটা যে আপনাদেরই হাতে। তাই মনের সুখে আপনারা অত্যাচার করে চলেছেন সমাজেব সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নারীর ওপর।

—কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয় যে আমাদের দেশেও বর্তমানে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার।

একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় সমাপ্তিকা, কেবল পুঁথিপত্রে।

—পুঁথিপত্রে কেন? বিদেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমাদের দেশেও বহু উচ্চশিক্ষিতা নারী সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

—কিন্তু পুরুষের তুলনায় তাদের সংখ্যা কত?

—তা, আর কী করা যাবে? তেমন যোগ্যতা কোথায় তাদের?

—থাকবে কী করে সেই যোগ্যতা? এতদিন তাদের সেই যোগ্যতা লাভের পথে গায়ের জোরে কাঁটা দিয়ে এসেছেন আপনারা। কিন্তু এখন আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না। তাই গেল-গেল রব তুলেছেন চারিদিকে। আজকে—এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও পৃথিবীর সমস্ত সভ্য সমাজের পুরুষের পক্ষে যে কাজটা কেবলমাত্র অন্যায়, নারীর পক্ষে তা, গুরুতর অপরাধ। এ কথা কি অস্বীকার করতে পারেন?

অভিমন্যু জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই স্ত্রীকণ্ঠের এক আর্তনাদে চম্‌কে তাকায় তারা।

সমুদ্রের একেবারে কোল ঘেঁসে একখানা গ্রাম। জেলেদের গ্রাম। মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে উঠোন। লম্বা বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা ভিজে জাল শুকোচ্ছে সমুদ্রের হাওয়ায়। এখানে-সেখানে বালির ওপর উপুড় করে রাখা সামুদ্রিক জেলে ডিঙ্গি।

আঁটসাঁট শাড়ি পরা একটি যুবতী নারী একখানা জালের বাঁশ শক্ত হাতে চেপে ধরে পরিত্রাহি চিৎকার করছে। অন্য হাতে তার একটা ছোট কাপড়ের পোঁটলা। কটিবাস পরা একটি জেলে যুবক যুবতীটিকে জোর করে বাড়ির ভেতর টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু যুবতীটি যাবে না। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে সেই বাঁশটি আঁকড়ে ধরে রাখতে। ধস্তাধস্তিতে হাতের পোঁটলাটা পড়ে যায় বালির ওপর। গ্রামের দু-চার জন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে দেখছে এই দৃশ্য। ব্যাপারটা ঠিক উপভোগ না করলেও কেউ এগিয়ে আসছে না সেই যুবতীকে সাহায্য করতে।

অবশেষে দম ফুরিয়ে আসে যুবতীটির। বেঁটেখাটো ষণ্ডাগোছের ঐ যুবকটির সঙ্গে কতক্ষণ যুঝতে পারে সে? একসময় সে এলিয়ে পড়ে বালির ওপর, আর যুবকটি তখন নির্মমভাবে তার দেহটা বালির

ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে বাড়ির দিকে। যুবতী কিন্তু তখনও সমানে চিৎকার করে চলেছে।

অভিমন্যু ও সমাপ্তিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে এই নির্মম দৃশ্য। ওদের ভাষা ভালমত বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে তাদের অসুবিধে হয় না যে যুবতীটি হচ্ছে ঐ যুবকটিরই স্ত্রী। কোন কারণে রাগ করে সে বাপের বাড়ি চলে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু স্বামীটি কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না। হয়ত এদের সমাজে এমনধারা ব্যাপার কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাই কেউ এগিয়ে আসে নি তাকে সাহায্য করতে।

ঘরের দরজার সামনে যুবতীকে টেনে এনে একরকম ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে আছড়ে ফেলে দেয় যুবকটি। তারপর সশব্দে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে সেখানেই উবু হয়ে বসে হাঁফাতে থাকে। পরিশ্রম তারও কম হয় নি।

একসময় অভিমন্যুই সমাপ্তিকার দিকে তাকিয়ে বললে, আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন? এবার চলুন ফেরা যাক্।

থম্‌থমে গম্ভীর মুখখানা সমাপ্তিকার। মুখে কথা নেই। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে সে হাঁটতে থাকে নিজের মনে। পাশে যে আরও একটি লোক রয়েছে সেকথা যেন সে একেবারে ভুলেই গেছে।

অভিমন্যুই আবার বললে, একী, একেবারে চুপ করে গেলেন যে?

অনিন্দ্যসুন্দর মুখের পটলচেরা চোখ দু'টোয় বিদ্যুৎ খেলে যায় সমাপ্তিকার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট অথচ শান্তকণ্ঠে বললে, কী আর বলব? একটি অসহায় নারীর ওপর কী ধরনের অত্যাচার আপনারা করেন তা' নিজের চোখে দেখলেন তো? সত্যি, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না লাগে আমার। আপনারা শুধু স্বার্থপরই নন, আপনারা নির্মম—আপনারা নিষ্ঠুর।

—কিন্তু—কিন্তু—। কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল অভিমন্যু।

—এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে সমাপ্তিকা।

একমুহূর্ত চিন্তা করে অভিমন্যু আবার বললে, মানছি যে যুবকটি তার স্ত্রীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার নিশ্চয়ই এদের মধ্যে হামেশাই ঘটে থাকে। তাই এসব বিষয় নিয়ে তেমন কেউ গা করে না এদের সমাজে। কিন্তু এটাই কি প্রমাণ করে যে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাব-ভালবাসা নেই ?

প্রায় ধমকে ওঠে সমাপ্তিকা, চুপ করুন! আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না! একটা অসহায় মেয়ের ওপর যে স্বামী এমন পশুর মত অত্যাচার করতে পারে, তাদের মধ্যে আর যাই থাক, ভালবাসার লেশমাত্র যে নেই তা' জোর করে বলা চলে। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তা'হলে কি করতাম জানেন ? ঐ নরপশুটাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ঐ সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতাম।

অভিমন্যু আর প্রতিবাদ করে না। এই সময় প্রতিবাদ করার অর্থই হল সমাপ্তিকার উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তোলা। তাই সে কথা না বলে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে।

দু'দিন পরে কিন্তু ঐ জেলেদের গ্রামেই আর একটা দৃশ্য চোখে পড়ে তাদের। সেই দৃশ্যের পাত্র-পাত্রীও সেই একই যুবক-যুবতী। মাথায় শূন্য মাছের ঝুড়িটি নিয়ে ক্লান্ত পায়ে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় সেই জেলে যুবকটি। বোধহয় হাটে কিম্বা বাজারে মাছ বিক্রি করে এইমাত্র ফিরেছে। মাথার ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে একবার এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর হাঁক দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সেই যুবতী। মুখে চোখে কেমন একটা খুশী খুশী ভাব।

যুবকটি মৃদুহেসে স্ত্রীর দিকে একবার তাকায়। তারপর মাছের ঝুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেনে তোলে একটা সস্তা দামের তেলের শিশি আর গোটাকয়েক চুলের কাঁটা।

আনন্দে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যুবতীর। স্বামীর হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে তেলের শিশিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

ছিপি-আঁটা শিশিটা নিজের নাকের কাছে নিয়ে টেনে টেনে একটু গন্ধ নেয়। তারপর আবার দেখতে থাকে সেটা। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না তার। অবশেষে স্বামীর দিকে তাকিয়ে হেসে কিছু বলতে যেতেই অকস্মাৎ তার দৃষ্টি পড়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অভিমন্যু ও সমাপ্তিকাব উপর। লজ্জা পায় মেয়েটি। স্বামীর গায়ে একটা মৃত্থ ধাক্কা দিয়ে ইশারায় তাকে ঘরে আসতে বলে একছুটে নিজে গিয়ে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে।

সেদিন হোটেলে ফিরতে ফিরতে অভিমন্যু বললে সমাপ্তিকাকে, সেদিন যদি আপনি সত্যি সত্যিই ঐ জেলে যুবকটিকে কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতেন তা'হলে কিন্তু আজ ঐ চমৎকার দৃশ্যটি দেখতে পেতেন না। বলেই মৃত্থ মৃত্থ হাসতে থাকে।

সমাপ্তিকা একবার আড়চোখে তাকায় অভিমন্যুর দিকে। তারপর জবাব দেয়, ঘুষ দিচ্ছে। সেদিনের অত্যাচারের পর আজকে এই ঘুষ দিয়ে ভুলোতে চেষ্টা করছে ঐ বোকা মেয়েটাকে।

আর কিছু না বলে মনে মনে ভাবতে থাকে অভিমন্যু—স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যেতে না দিয়ে জোর করে নিজের কাছে ধরে রাখার সবটুকুই কি স্বামীর নির্মমতার পরিচয়? কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে সামান্য কিছু উপহার নিয়ে দিনের শেষে ঘরে ফিরে ঘরণীর হাসিমুখ দেখার ইচ্ছেটা কি কেবল উৎকোচে বশীভূত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা? আর, এ কথা কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে সমাপ্তিকা? না, এগুলো সবই তার যুক্তির বেড়াজাল মাত্র?

সমাপ্তিকার মুখের পানে একবার নিঃশব্দে তাকায় অভিমন্যু। চেষ্টা করে তার মনের কথাটি জানতে। কিন্তু কেবল মুখ দেখে নারীর মনের কথার হদিশ পাওয়া শুধু ত্নঃসাধ্যই নয়, অসাধ্য।

সেদিন আর বেড়াতে যায় নি তারা। অনেক বেড়িয়েছে তারা এ ক'দিন। আজ তাই ঘরে ফেরার মুহূর্তে পাশাপাশি বালির ওপর বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল অভিমন্যু ও সমাপ্তিকা।

কাল সকালেই চলে যাবে সমাপ্তিকা। কথাটা শুনেই বিমর্ষ মুখে অভিমন্যু বলেছিল, সেকি? এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন? এই তো সেদিন বললেন মাসখানেক থাকবেন এখানে। তা'ছাড়া আপনার কলেজ খোলার কোন খবর তো আজকের কাগজেও দেখলাম না।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল সমাপ্তিকা, না, কলেজের জন্যে তেমন একটা চিন্তিত নই আমি। কিন্তু এখানে বসে বসে খেয়ে বেড়িয়ে একা একা আর ভাল লাগছে না। তাই ভাবছি কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাব।'

খানিকক্ষণ চুপ করে বসেছিল অভিমন্যু। মনে মনে ভাবছিল— তা'হলে এই ক'দিনে সে এতটুকু রেখাপাত করতে পারে নি ঐ পুরুষ-বিদ্বেষী নারীটির মনে! তার সান্নিধ্য সমাপ্তিকার কাছে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তাই তার একা একা আর ভাল লাগছে না এখানে থাকতে।

কঠিন আত্মশাসনে মনের বেদনা-বিজড়িত ভাবটাকে চেপে রাখে অভিমন্যু। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর নিজের মানসীকে কাছে পেয়ে মনটা আনন্দে এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল যে, তাকে হারাবার কথাটা এই ক'দিন মনে ওঠে নি। ভুলেই গিয়েছিল অভিমন্যু যে সমাপ্তিকা বরাবরের জন্যে থাকতে আসে নি এখানে। তাকে চলে যেতে হবে।

অবশ্যি চলে যেতে হবে অভিমন্যুকেও। কিন্তু তার সময় হয় নি এখনও। বাড়িতে বাবা রেগে গিয়ে কতটা কি কাণ্ড বাঁধালেন তার খবর এখনও নেয়া হয় নি। সেই খবর না নিয়ে যেতে পারে না সে।

সমাপ্তিকার কলকাতা ফিরে যাবার এমন কোন জরুরী তাড়া ছিল না। ইচ্ছে করলে সে আরও কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে এখানে থেকে যেতে পারত। তেমন একটা ইচ্ছে যে তার মনের কোণে একেবারেই স্থান পায় নি এমনও নয়। কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিল সমাপ্তিকা। নিজের মনের মুকুরে একটি পুরুষের ছায়া দেখতে পেয়েই ভয় পেয়েছিল সে। মনের মধ্যে গেঁথে থাকা পুরুষ-বিদ্বেষের যুক্তির কঠিন আঘাতেও সে

তাড়াতে পারে নি সেই ছায়া। মনটা যতই দুর্বল হতে থাকে, সেই অস্পষ্ট ছায়াটাও যেন ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সমাপ্তিকা, তাই পালিয়ে যেতে চায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার। নইলে ঐ ছায়া একদিন ছড়িয়ে পড়ে তার সমস্ত মনটাকে গ্রাস করে ফেলবে।

সমাপ্তিকার সঙ্গে স্টেশনে গিয়েছিল অভিমন্যুও। একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে বার্থ রিজার্ভেশান্ করে ফিরেছিল তারা। সারা দিনটা জিনিসপত্র গোছগাছ করতে কেটেছে সমাপ্তিকার। বিকেলে দু'জনে এসে বসেছিল সমুদ্রের পাড়ে।

সমাপ্তিকা যেন একটু বেশি কথা বলছে আজ। আজ আর কোন বিতর্কমূলক আলোচনা নেই তার মুখে। হাল্কা ধরনের একথা-সেকথা সে বলে চলেছিল একটানা।

অভিমন্যু কিন্তু সংযত—যেন একটু বেশি সংযত আজ। মুখখানা গম্ভীর।

একসময় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সমাপ্তিকা বললে, কবে সেই ছেলেবেলায় ভূগোল পড়েছিলাম ভুলেই গেছি। আচ্ছা বলুন তো, এই বঙ্গোপসাগরের ওদিকটায় কোন্ দেশ? সেই হাত দিয়ে পূব দিকটা দেখিয়ে দেয়।

একটু আগেই অস্ত গেছে সূর্য। তার লালচে আভা এখনও ছড়িয়ে রয়েছে পশ্চিম আকাশে। আকাশের লাল রং দূরের নীল জলরাশিকেও রাঙ্গিয়ে তুলেছে এক বিচিত্র বর্ণে।

সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় অভিমন্যু, আমাদের ঠিক পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ। আর ঐ দক্ষিণ-পূব কোণে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

সমুদ্রের হাওয়ায় মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়া চুল হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সমাপ্তিকা আবার বললে, আজকাল ঐ আন্দামান-নিকোবরে অনেকেই বেড়াতে যায়। জায়গাটা নাকি সত্যিই সুন্দর।

—হ্যাঁ, তাই, আমিও একবার গিয়েছিলাম। তেমনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় অভিমন্যু।

উৎসাহিত হয়ে ওঠে সমাপ্তিকা। বললে, গিয়েছিলেন নাকি? ভারি চমৎকার জায়গা, তাই না?

—হ্যাঁ, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। তা'ছাড়া প্রচুর বাঙ্গালী রয়েছে ঐ আন্দামানে—বিশেষ করে রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের কাছাকাছি।

একটু সময় চুপ করে থেকে সমাপ্তিকা আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা কতগুলো দ্বীপ আছে ওখানে?

—অসংখ্য—কয়েক শত হবে। তবে সবগুলোই মনুষ্য বাসোপযোগী নয়।

একমুহূর্ত মৌন থেকে সমাপ্তিকা বললে, জানেন, ওখানে বেড়াতে যাবার সখ আমার অনেকদিনের। একবার প্রায় সবকিছু ঠিক্ করেও ফেলেছিলাম। হঠাৎ কলেজের দু'তিনটি মেয়ে বেঁকে বসল। যাওয়া হল না আর। দল বেঁধে না গিয়ে একা একা কি ওসব জায়গায় বেড়াতে ভাল লাগে? আপনিও নিশ্চয়ই একা যান নি।

—না, একজন ডাক্তার বন্ধু ছিল সঙ্গে।

সমাপ্তিকার প্রশ্নের জবাব দিলেও এই আলোচনায় তেমন কোন উৎসাহ পাচ্ছিল না অভিমন্যু। সকাল থেকেই তার মনটা ভারী হয়ে ছিল। সমাপ্তিকা চলে যাচ্ছে। আর ঘণ্টা কয়েক পরেই সে চলে যাবে এখান থেকে। হয়ত সঙ্গে করে অভিমন্যুর এতটুকু স্মৃতিও সে নিয়ে যাবে না। আশ্চর্য এই নারী! মনটা বোধহয় ওর পাথর দিয়ে তৈরি।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সমাপ্তিকার মনটা কি সত্যি সত্যি পাথরে তৈরি? তা'হলে সেদিন রাতে হোটেলে ফিরে এসে নিজের ঘরে অমন স্থির হয়ে বসে কিসের চিন্তা করছিল সে? চোখ দুটোই বা কেন ছল্‌ছল্ করছিল তখন? তবে কি বাইরে অভিমন্যুর কাছে নিজেকে লুকোতে সমর্থ হলেও নিজের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল সমাপ্তিকা?

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে বেহালা বাজায় অভিমন্যু। সেই করুণ সুরের মূর্চ্ছনা যেন গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে থাকে। সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন শোকে মুহ্যমান—বিরহবেদনায় কাতর।

সেই সুরের তরঙ্গ এসে সমাপ্তিকার হৃদয়তন্ত্রীকেও আঘাত করে। ক্ষেত্র ছিল প্রস্তুত। প্রযোজন ছিল মাত্র একটি স্ফুলিঙ্গের। চোখের কোণদুটো জ্বালা করে ওঠে সমাপ্তিকার।

বেহালার সুর থেমে যেতেই কিন্তু নিজেকে সামলে নেয় সমাপ্তিকা। ছি-ছি, এত দুর্বল সে? আর পাঁচটি নারীর মত তার নিজের মনটাও কি তবে একই ধাতুতে গড়া? না-না, কখনই না। সে একক। অন্যের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ।

ক্ষণিকের দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় সমাপ্তিকা। বাইরে অন্ধকার। একটানা সমুদ্রের গর্জন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে সেই অশান্ত গর্জন। তারপর একসময় এসে শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায়।

শুয়েও কিন্তু ঘুম আসে না সমাপ্তিকার। কাল সকালেই সে চলে যাবে এখান থেকে। হ্যাঁ, চলে যাওয়াই ভাল। ঐ অভিমন্যু তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখানে আর থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। লোকটি যদিও তেমন খারাপ নয় কিন্তু তবুও সে পুরুষ। প্রয়োজন হলে সে জঙ্গলের বাঘের সঙ্গেও সহাবস্থানে রাজি কিন্তু এই স্বার্থপর পুরুষ জাতটার সঙ্গে মোটেই নয়।

সেই জেলে মেয়েটার কথা মনে পড়ে। কী নির্মম অত্যাচার—কী দারুণ নিগ্রহ! সত্যিই নির্লজ্জ সেই মেয়েটা। অমন অত্যাচারের পরেও সে হাসিমুখে এসে আবার দাঁড়িয়েছিল সেই নরপশুটার সামনে! হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল তারই দেওয়া সামান্য একশিশি তেল! বলিহারি আক্কেল মেয়েটার!

এখানকার নানা ঘটনার টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমাপ্তিকার। সেই বিকটদর্শন লোকটা—অভিমন্যু বলেছিল

লোকটা নাকি পাগল। হয়ত তাই। সত্যিই সেদিন দারুণ ভয় পেয়েছিল সমাপ্তিকা। অভিমন্যুর সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে পরের দিনই সে চলে যেত এখান থেকে।

সবকিছু মিলিয়ে এখানে তার তেমন মন্দ কাটে নি এই ক'দিন। সমুদ্র বরাবরই ভাল লাগে তার কাছে। আবার সে আসবে এখানে। তবে একা নয়, দল বেঁধে। কলকাতা ফিরে গিয়ে ঐ আন্দামান—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে যাবার একটা প্ল্যান্ তৈরি করতে হবে। চারিদিকে নীল সমুদ্র। মাঝে ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ। প্রকৃতি সৌন্দর্যে ভরপুর। মনে পড়ে তার ছেলেবেলায় পড়া রবিন্সন ক্রুসোকে। ঐ রকম একটা নির্জন দ্বীপেই হয়ত সে কাটিয়েছিল তার জীবনটা। ব্যাপারটা কল্পনা করতেই ভাল লাগে তার। কিছুদিন আগে বিখ্যাত আয়ান ফ্লেমিং-এর 'ডঃ নো' বইটা পড়েছিল সে। ঐরকম দ্বীপের পর্বতসঙ্কুল এলাকায় নিজের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল ডঃ নো, বাইরের পৃথিবীর চোখের আড়ালে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরক্ষিত করেছিল সেই ঘাটি। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের বিখ্যাত জেম্‌স বন্ড ভেদ করেছিল সেই ঘাঁটির রহস্য।

ভাবতে ভাবতে মাথার স্নায়ুগুলো নিস্তেজ হয়ে আসে সমাপ্তিকার। ভারী হয়ে আসে চোখের পাতা। বাইরে সমুদ্রের একটানা গর্জন। আর ঘরের মধ্যে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে এমন এক পুরুষ-বিদ্বেষী নারী যে নাকি স্ত্রী-পুরুষের সত্যিকারের মধুর সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থপরতা, অবিচার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।

নিদ্রায় আচ্ছন্ন সুন্দরী সমাপ্তিকা। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে তার উত্তুঙ্গ বুকটা। সারা মুখে একটা প্রশান্তির ছায়া।

ঘুমের মধ্যে অকস্মাৎ একটা ভিন্ন জগতের দরজা খুলে যায় সমাপ্তিকার চোখের সামনে। একটা স্বপ্নময় সুন্দর জগৎ যেখানে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেখানে পুরুষের অন্যায় অবিচারের প্রশ্নই ওঠে

না, কাবণ, পুরুষেব অস্তিত্বই নেই, যেখানে নাবীব ভাগ্যনিয়ন্তা নাবী নিজে। পুরুষেব পক্ষে নিষিদ্ধ তেমন এক প্রমীলা বাজ্যেব অধীশ্ববী স্বযং সমাপ্তিকা।

।। চাব ।।

সমুদ্রঘেবা সুন্দব একটি দ্বীপ। আযতনে ছোট নয় কেমন—এই খণ্ডিত বাংলাব মতই হবে। একদিকে সমুদ্রকে আডাল কবে বযেছে ঢেউখেলানো পাহাড। বাকি তিন দিকেব জমি ক্রমশঃ ঢালু হযে এসে মিশেছে সমুদ্রে। সমুদ্র এখানে শান্ত নয, আবাব খুব অশান্তও নয। ঢেউগুলো এসে ভীমবেগে আছডে পডে না উপকূলে। তাব বদলে তাবা একেব পব এক এসে আলতোভাবে ছুঁযে যায উপকূলেব মাটি। জলে-স্থলে বিবাদ নেই এখানে, আছে সখ্যতা। সমুদ্র গর্জন কবে না এখানে, কেবল মৃদুমন্দ সুবে গান গায।

নাতিশীতোষ্ণ এই দ্বীপেব চাবিদিকে ঘন সবুজেব বন্যা। গাছপালাব ফাঁকে ফাঁকে চোখে পডে ছোট ছোট গ্রাম—যেন সেই সুজলা সুফলা বাংলাদেশেবই মত। তবে বর্তমান বাংলাব গ্রামেব মত সেগুলো বিক্ত অবহেলিত নয। ববং ইউবোপেব আদর্শ গ্রামেব মত সমৃদ্ধ, প্রাণচঞ্চল।

গৃহস্থেব ঘবে ঘবে আছে গোলাভবা ধান, গোযালভবা গরু আব পুকুবভবা মাছ—ঠিক্ যেমনটি ছিল আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছব আগে গ্রাম-বাংলায়।

শবতেব শিশিবভেজা হাওযা দোলা দেয সুপুষ্ট ধানেব শীষে। দোয়েল পাখী দোল খায় গাছেব ডালে। সাথীহাবা পাপীযা মিষ্টি সুবে ডেকে ডেকে খুঁজতে থাকে তাব সঙ্গীকে। মৌমাছি মধুব লোভে লুটোপুটি খায ফলেব সোনালী বেণুব মধ্যে।

সমুদ্রেব জলে প্রাতঃস্নান সেরে রক্তবস্ত্র-পবিহিত সূর্যদেব উদয় হন

পুবের আকাশে। সারাটা দিন মাথার ওপরে থেকে আশীর্বাদ করেন এই দ্বীপের অধিবাসীদের। আবার সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে ঢলে পড়েন পশ্চিমের পাহাড়ের চূড়োর আড়ালে।

শুধুমাত্র গ্রাম নিয়েই এই দ্বীপটি নয়। সহরও আছে এখানে—ছোট-বড়, মাঝারি নানারকম। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সহরের সবরকম সুযোগ-সুবিধেই রয়েছে এখানে। এ যেন অতীতের সরলতা আর সৌন্দর্যের সঙ্গে বর্তমানের বিজ্ঞাননির্ভর নাগরিকতার এক অপূর্ব সমন্বয়।

দ্বীপটির ঠিক একপাশে সমুদ্রের কাছে রাজধানী—আধুনিক যুগের একটি মহানগরী। ইউরোপের যে-কোন প্রথমশ্রেণীর সহরের চেয়ে কোন বিষয়েই খাটো নয়—না বিরাটত্বে, না সৌন্দর্যে, না ঐশ্বর্যে। বড় বড় প্রশস্ত রাজপথের দুই পাশে ঝাউ আর দেবদারু গাছের সারি। রাস্তার সংযোগস্থলে ঘাসে আচ্ছাদিত ট্র্যাফিক্ আইল্যাণ্ড। দু'ধারে আকাশচুম্বী অট্টালিকা। আধুনিক সহরের মত ট্রামগাড়ি বর্জিত এই মহানগরী। কিন্তু তাই বলে যাতায়াতের অসুবিধে নেই একটুও। আছে ট্রলি বাস—একতলা-দোতলা, আর আছে টোকিও সহরের মত মনোরেল—দু'টোর বদলে মাত্র একটি লাইনের ওপর দিয়ে চলে সেই রেলগাড়ি।

এই মহানগরীর রাতের সৌন্দর্য বাস্তবিকই একটা বিস্ময়। সুযোগ থাকলে সারা পৃথিবীর ট্যুরিস্টরা এসে ভিড় জমাতো এখানে। কিন্তু সেই সুবিধে নেই। সরু বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি মাছ ধরার খাঁচার মধ্যে যেমন মাছ ঢুকতে পারে কিন্তু বেরোতে পারে না, ঠিক তেমনি এই দ্বীপে একবার এসে হাজির হলে আর ফিরে যাবার উপায় থাকে না। সমস্ত জীবন-ভোর থাকতে হয় এখানে। চাকুরি করতে চাও চাকুরি কর, ব্যবসা করতে চাও ব্যবসা কর, খাও দাও স্ফুর্তিতে থাক। কিন্তু এই দ্বীপ ছেড়ে বাইরে বেরোবার কোন উপায় নেই। সেই চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। চারিদিকে সমুদ্র। বিদেশী কোন জাহাজ কিম্বা নৌকোও

নোঙর ফেলতে পারে না এই দ্বীপের কাছাকাছি। চারিদিকে সদাসতর্ক প্রহরী। দ্বীপের সবচেয়ে কাছাকাছি মেন-ল্যাণ্ড্ এখান থেকে একশ' মাইল দূরে।

সব থেকে আশ্চর্য এই দ্বীপের অধিবাসীরা। তারা সকলেই নারী। কোন পুরুষ নেই এ রাজ্যে। কোন পুরুষের প্রবেশাধিকারও নেই এখানে। কোন্ কালে নাকি একজন বিদেশী পুরুষ পর্যটক কৌতূহলী হয়ে একখানা সমুদ্রগামী মোটর লঞ্চে করে এসেছিল এই রাজ্যে। কিন্তু ফিরে যেতে পারে নি আর। প্রহরীদের মেশিনগানের মুখে জীবন দিতে হয়েছিল তাকে। সেই থেকে পৃথিবীর অন্য কোন পুরুষ আর আসতে চেষ্টা করে নি এই রাজ্যে। পুরুষের কাছে নিষিদ্ধ এই রাজ্য নিষিদ্ধই থেকে গেছে। বিদেশের সঙ্গেও তেমন একটা যোগাযোগ নেই এই রাজ্যের। মাত্র খান কয়েক জাহাজ বিদেশী পণ্য নিয়ে আসে এখানে। আর এই রাজ্যের পণ্য নিয়ে যায় সেই একশ' মাইল দূরের মেন-ল্যাণ্ডে। ব্যবসা বাণিজ্যের এইটুকুই মাত্র যোগসূত্র। ঐ জাহাজগুলোর মাঝিমাল্লা থেকে স্থুরু করে ইঞ্জিনীয়ার, মায় ক্যাপ্টেন্ পর্যন্ত মহিলা।

অবশ্যি একদিক থেকে জাহাজের ঐ কর্মীরাই ভাগ্যবতী। কেবলমাত্র ওরাই সংগ্রহ করতে পারে বিদেশের খবর। দেখতে পায় বিদেশের নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবন। কিন্তু সেখানেও সদা সতর্ক প্রহরা। মেন-ল্যাণ্ডে গিয়ে জাহাজের কোন নারী কর্মী মিশতে পারে না সেখানকার কোনো পুরুষের সঙ্গে। বিয়ে করার তো প্রশ্নই ওঠে না! তীক্ষ্ণ নজর ক্যাপ্টেনের।

আধুনিক সভ্যতার সবকিছুই আছে এই প্রমীলা-রাজ্যে। আছে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, কোর্ট-কাছারী, ইঞ্জিনীয়ারিং আর ডাক্তারী কলেজ। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে মেয়েরা, গাড়ি চালায় মেয়েরা, মাঠে ফসল ফলায়, পুকুরে মাছ ধরে, ফ্যাক্টরিতে মজুর খাটে, খনি থেকে কয়লা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু তোলে—সব মেয়েরা। এমনকি

এদেশের বিরাট পুলিশ বাহিনীটিও মেয়েদের দিয়েই তৈরি। নারী বলে পুলিশের কাজে কম পটু নয় তারা। রাজ্যের খবরাখবর তাদের নখাগ্রে। বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কিম্বা এফ্-বি-আই-এর গোয়েন্দাদের চাইতে কোন অংশেই কম পারদর্শিনী নয় এরা।

এখানে সিনেমা আছে, থিয়েটার আছে এমনকি টেলিভিশন পর্যন্ত আছে। কিন্তু সবকিছুই পুরুষ-ভূমিকাবর্জিত। পুরুষের অভিনয় মেয়েরাই করে থাকে এখানে। আর জীবনের হাসি-কান্না, প্রেম প্রীতি, সোহাগ ভালবাসার ছবি পুরুষবেশী অভিনেত্রীরা যখন সিনেমার রূপোলী পর্দায় কিম্বা থিয়েটারের মঞ্চে ফুটিয়ে তোলে, তখন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের কিম্বা রঙ্গমঞ্চের নারী দর্শকেরা মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি তুলে অভিনন্দন জানায়। আসলে চিরকাল বঞ্চিত তারা, তাই নকলেই তাদের আনন্দ।

পুরুষবর্জিত এই প্রমীলা-রাজ্যের আইন-কানুন বড় ভারি কড়া। আইন এখানে কারুর মুখাপেক্ষী নয়। সে নিজের পথ ধরে নির্মমভাবে এগিয়ে চলে।

এদেশে সবার চাইতে গুরুতর অপরাধ হচ্ছে পুরুষ সম্পর্কে কৌতূহল। সমস্ত দেশটায় একখানা পুরুষের ছবিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুরুষের ছবি কাছে রাখাও এখানে গুরুতর অপরাধ। তাই বাইরে থেকে সেই সমস্ত পত্রপত্রিকা এবং জার্নালই কেবল এ দেশে আসে যার মধ্যে নারী ছাড়া কোন পুরুষের ছবি নেই। গল্প-প্রবন্ধও সব নারী সম্বন্ধেই লেখা।

পুরুষহীন এই দ্বীপে স্বাভাবিক কারণেই প্রজা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রজা আমদানী হয়। দেশ বিদেশের অত্যাচারিতা অবহেলিতা নারীরা এসে আশ্রয় পান এখানে। শুধু আশ্রয় নয়, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন-যাপনের আশ্বাসও মেলে। কিন্তু সর্ত থাকে এই যে, তারা কোনদিন এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে চাইবে না এবং তাদের পুরুষ-বিদ্বেষী মনোভাবকে চিরদিন বজায় রাখতে হবে। অধিকাংশ নারীই এখানে এসে আশ্রয় নেয় পুরুষ কর্তৃক নিগৃহীতা হয়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই

একটা পুরুষ-বিদ্বেষী মনোভাব তাদের থাকে। সেই মনোভাবটিকেই বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ, কারণ তারা জানে তাদের এই প্রমীলা রাজ্যের অস্তিত্ব নারীর ঐ পুরুষ-বিদ্বেষী মনোভাবের ওপরই নির্ভরশীল। যেদিন দেশের প্রজাপুঞ্জের মন থেকে ঐ ভাবটি সম্পূর্ণ উবে যাবে, সেদিন এই রাজ্যের গোটা কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়বে।

স্বামী কর্তৃক নিগৃহীতা কিম্বা বিতাড়িতা দেশ-বিদেশের মায়েরাও এসে আশ্রয় পায় এখানে। সঙ্গে তারা শিশু-কন্যা নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু শিশু-পুত্রের বেলায় একটা নির্দয় কিন্তু সঙ্গত নিয়ম পালনের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় তাদের। ছ'বছরের বেশি বয়স এমন কোন শিশুপুত্র নিয়ে তারা এখানে থাকবার অনুমতি পায় না। তার চাইতে কম বয়সের পুত্র নিয়ে এসে থাকতে পারে এখানে। কিন্তু পুত্রের বয়স ছ'বছর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে বিদেশে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে কিম্বা কোন আশ্রমে। প্রয়োজন হলে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হবে ছেলেকে। বাধা দেবার অধিকার নেই মায়ের। বিদেশে সেই ছেলের খবরাখবরও কোনদিন পাবে না তার মা, কারণ এই রাজ্যের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান নেই কোন দেশের। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে সরকারী মহলে কিছু চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে বিদেশের, বিশেষ করে সেই 'কেশ' মাইল দূরের মেন-ল্যাণ্ডের সঙ্গে।

তাই যেসব মেয়েরা একেবারে শিশু-বয়সে এদেশে এসেছে, তারা জীবনে কোনদিন আসল পুরুষের চেহারাই দেখে নি। সিনেমা থিয়েটারে নকল পুরুষের চেহারা দেখতেই তারা অভ্যস্ত। কিন্তু তাতে কি মন ভরে তাদের?

যৌবনের ডাক যখন তারা শুনতে পায়, যৌবনের জোয়ার যখন তাদের দেহ-মন-প্রাণকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তোলে, তখন প্রকৃতির নিয়মে বন্য হরিণীর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা। যৌবনের

ডালি সাজিয়ে আকাশকুসুম কল্পনা করে—একদিন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সেই সুন্দরকান্তি রাজপুত্র এসে হাজির হবে তার কাছে। নিয়ে যাবে তাকে নিজের দেশে। সেই রাজপুত্র দেখতে কেমন? সিনেমা-থিয়েটারের পুরুষ-বেশধারী নারীর চেয়ে অনেক বেশি সুপুরুষ—অনেক বেশি বলিষ্ঠ—অনেক বেশি সাহসী। কিন্তু সেসব যে কেবল নিছক কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয় তা' তারা নিজেরাও জানে। কেউ আসবে না পক্ষীরাজে চড়ে। কেউ তার ঘুম ভাঙাবে না সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে রূপ-কথার রাজপুত্রের মত। নিয়ে যাবে না কেউ তাকে এখানে থেকে। তাই গাছের ফুল গাছেই ঝরে পড়ে। কেউ আসে না তার ঘ্রাণ নিতে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণচাঞ্চল্য আবার কমেও আসে তাদের। না পাওয়ার দুঃখ গা-সহা হয়ে যায়। নৈরাশ্য থেকে জন্ম নেয় একটা অভিমান—অদৃশ্য সেই পুরুষ জাতটার ওপর এক প্রচণ্ড অভিমান। পুঞ্জীভূত সেই অভিমান-জ্বালা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় ক্রোধে। একটা দারুণ বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় পুরুষের ওপর। আর, তারা চেষ্টা করে সেই বিদ্বেষের বিষ নবীনাদের মধ্যে সংক্রামিত করতে। তাদের চঞ্চলতা দেখে প্রবীণারা হাসে, বিদ্রুপ করে, উপদেশ দেয়। কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ করে না নবীনারা। কালের গতিতে এই নবীনারাই আবার একদিন প্রবীণা হয়ে ওঠে। এমনিভাবেই ঘুরতে থাকে সামাজিক ব্যবস্থার চক্র। দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে সেই প্রমীলা-রাজ্যের ভিত।

রাজধানী মহানগরী কস্‌মোপলিটন্। পৃথিবীর সব দেশের নারীই রয়েছে এখানে। ইউরোপের ফর্সা সুন্দরী নারী, আফ্রিকার কালো কুচকুচে ললনা, বেঁটে খাটো চ্যাপ্টা নাক ও ক্ষুদে চোখের অধিকারিণী মঙ্গোল-তনয়া, এমন কি আরব রাজ্যের পর্দানশীন সুন্দরীর দলও বাস করে এখানে। তবে, পর্দানশীন হয়ে থাকতে হয় না আরবী মেয়েদের। পুরুষের অস্তিত্বই যেখানে নেই সেখানে আবার পর্দার প্রয়োজন কি?

অবশ্যি এরা সকলেই সংখ্যালঘু। এদের অধিকাংশেরই বাস এই রাজধানী কিম্বা অন্য কোন শহরে। এ রাজ্যের আসল বাসিন্দারা ভারতীয়—বিশেষ করে বঙ্গজ। তাই দেশের সরকারী ভাষাও বাংলা।

পুরুষহীন এই প্রমীলারাজ্যের প্রতাপান্বিত অধীশ্বরী হচ্ছে বিশ বছরের সুন্দরী যুবতী সমাপ্তিকা। তার সরকারী পদবী—গভর্ণর।

বিরাট গভর্ণর প্যালেস্। তার একপাশে গভর্ণরের খাস অফিস। অন্যদিকে তার অন্দর মহল। প্যালেসের চৌহদ্দীর মধ্যেই তার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কোয়ার্টার। আড়ম্বরহীন সাধাসিধে পোশাকে থাকে গভর্ণর সমাপ্তিকা। কিন্তু অসীম ক্ষমতা তার। এই দ্বীপের লক্ষ লক্ষ নারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী সমাপ্তিকা। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ও মুহূর্তে নাকচ করে দেবার ক্ষমতা তার আছে।

প্রশাসক হিসেবে কড়া মেজাজের অধিকারিণী সমাপ্তিকা। দৃঢ় হাতে রাজ্য পরিচালনা করে সে। একদিকে যেমন তার অসীম ধৈর্য, অন্যদিকে আবার সে তেমনি নির্দয়, নির্মম। রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থে সে আপোষহীন উগ্র পুরুষ-বিদ্বেষী।

সন্ধ্যা হতে তখনও কিছু বাকি। রাজধানীর এক বিশিষ্ট পল্লীর একপ্রান্তে একখানা নবনির্মিত দোতলা বাড়ি। ঐ বাড়ির মালিক প্রৌঢ়া সুলোচনা।

দোতলার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে চোখে চশমা লাগিয়ে একখানা বই পড়ছিল সুলোচনা। গোধূলির আলোয় পড়তে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। কিন্তু তবুও ছাড়তে পারছিল না বইটা।

এমনি সময় কক্ষের মধ্য থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায় একটি আঠারো-উনিশ বছরের যুবতী। একটু সময় সে তাকিয়ে থাকে সুলোচনার দিকে। তারপর মৃদু শাসনের সুরে বললে, আবার তুমি ডাক্তারের বারণ না শুনে বসে বসে বই পড়ছ, মা?

মৃদুহেসে কন্যার মুখের পানে মুখ তুলে তাকায় সুলোচনা, তারপর জবাব দেয়, না—না, এই তো একটুখানি দেখছি মাত্র বইটা—

একটুখানি দেখছি মাত্র বইটা ? মা'র কথার পুনরাবৃত্তি করে স্বাগতা। তারপর তার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিতে যেতেই সুলোচনা সেটা বন্ধ করে আবার বললে, না—না, আর পড়ব না। এই বন্ধ করলুম।

মা ও মেয়ে দু'জনেই দু'জনার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে। বড়ই মিষ্টি লাগে কন্যার এই শাসন সুলোচনার। চোখ তার সত্যিই খারাপ। এই চোখের জন্যেই অসময়ে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিতে হয়েছে তাকে। অবশ্যি সরকার থেকে সে একটা মোটা টাকার পেন্‌সন পায় প্রতিমাসে।

হাসি থামলে সুলোচনা এবার প্রশ্ন করে কন্যাকে, তুই আবার কোথায় চললি এই সময় ? একটু আগে না বললি তোর খুব মাথা ধরেছে ?

জবাব দেয় স্বাগতা, তা অবশ্যি বলেছিলাম। কিন্তু এখন হঠাৎ মনে পড়ল একবার মা-পানের বাড়ি যেতে হবে।

—মা-পান ? সে আবার কে ? ও, সেই বর্মী মেয়েটা ? তা' এই সময় আবার তাদের বাড়ি যাওয়ার এমন কী প্রয়োজন হ'ল তোর ? কলেজেই তো দেখা হয় তার সঙ্গে।

বলতে থাকে স্বাগতা, মা-পান কলেজ ছেড়ে দিয়েছে মাস দু'য়েক আগে। মেয়েটা পড়াশোনোয় খুবই ভাল ছিল, কিন্তু পয়সার অভাবে ছেড়ে দিতে হ'ল। ওর মা'র কঠিন অসুখ। তাই বাধ্য হয়ে অনেক চেষ্টা-তদ্বিরের পর জাহাজে একটা চাকরি জুটিয়েছে বেচারা।

—জাহাজের চাকরি ? সে তো ভালই, অবশ্যি যদি নিজেকে ঠিক রাখতে পারে। ঐ চাকরিতে বাইরে গিয়ে নিজেকে ঠিক রাখা খুবই কষ্টকর। তা, জাহাজে কীসের চাকরি পেল ?

—এ্যাপ্রেন্টিস্—ইঞ্জিনীয়ার এ্যাপ্রেন্টিস। জাহাজটার নাম চন্দনা। এই দু'মাস বাইরে ঘুরে মাত্র কালই বাড়ি ফিরেছে মা-পান। তাই আজ আমাকে যেতে বলেছে।

—তা যাচ্ছিস যা। তবে বেশি দেরি করিস না কিন্তু। আমার আবার শরীরটা আজ ভাল নেই। বলেই একটা হাই তোলে সুলোচনা।

পায়ের স্লিপারের মৃদু শব্দ তুলে নীচে নেমে যায় স্বাগতা। সুলোচনা তাকিয়ে থাকে কন্যার গমন পথের দিকে।

এই স্বাগতাই এখন তার চোখের মণি। আরও তিনটি পুত্র ছিল তার। কিন্তু এখন তারা কোথায় কে জানে?

ভাবতে ভাবতে সুলোচনা ফিরে যায় উনিশ বছর আগেকার সেই ভয়ঙ্কর দিনটির মধ্যে। মনে পড়লেও গা'টা ছম্ ছম করে ওঠে এখনও।

স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার ছিল তার। এমনি দিনে এক গভীর রাতে রে-রে শব্দে একদল ডাকাত পড়েছিল তাদের গ্রামের বাড়িতে। ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল সুলোচনা।

দরজা ভেঙে ডাকাতরা ঢুকলো তাদের বাড়িতে। পাশের ঘরে তার বুড়ি শাশুড়ী কেঁদে উঠলেন। ভয় পেয়ে তার ছোট ছেলেটাও কেঁদে উঠল ঠাকুমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে। ছেলেটা তার ঠাকুমার সঙ্গে শুতো।

পাশের ঘরের জিনিসপত্র লুঠপাটের পর ডাকাতগুলো এসে হানা দেয় তাদের ঘরে। বন্ধ দরজার সামনে একটা মোঠা লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিল তার স্বামী। ভয় পেয়ে ঘরের মধ্যে তার বড় ছেলে দু'টো কাঁদছে। বাইরের প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজার খিল ভেঙে গেল। ডাকাতগুলো ঘরে ঢুকে প্রথমেই কাবু করে ফেললে তার স্বামীকে। দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল বারান্দায়। তারপর আরম্ভ হ'ল লুঠপাট। বড় ছেলে দুটোর কান্নায় বিরক্ত হয়ে একটা ডাকাত তাদেরও বের করে দিলে বাইরে। খাটের এককোণে বসে থর থর করে কাঁপছিল সুলোচনা। মশালের আলোয় ডাকাতগুলোর মুখ দেখাচ্ছিল ভয়ঙ্কর।

সিন্দুক বাক্স খুলে সোনাদানা কাপড়-চোপড় টাকাপয়সা সব-কিছু বের করে নিলে তারা। তারপর একটা ডাকাত মশাল হাতে এসে দাঁড়াল তার সামনে। কর্কশ কণ্ঠে সুলোচনার গায়ের গহনা খুলে দিতে বলল।

ভয়ে কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল সুলোচনা। কম্পিত হাতে কানের দুল, হাতের চুড়ি খুলে দিল সে। তারপর গলার হার খুলতে গিয়েই হল সেই বিপত্তি। সেদিন যদি সহজভাবে গলার হারটা খুলে সে তুলে দিতে পারতো ডাকাতটার হাতে, তবে হয়ত তার জীবনের ধারাটাই পাল্টে যেত একদম। এমনি, নিঃসঙ্গভাবে এই দেশে এসে বাস করতে হত না তাকে।

কিন্তু গলার হার খুলতে পারে নি সুলোচনা। খোপার নীচে হাত দিয়ে হারের মুখটা খুঁজে পেল না সে। এদিকে তাড়া দিচ্ছে সেই ডাকাতটা। ত্রস্ত হাতে হারটা টেনে ছিঁড়তে গিয়ে বুকের কাপড় খসে পড়ল তার।

গরমের দিন। গায়ে জামা ছিল না সুলোচনার। তাড়াতাড়ি বুকের কাপড়টা টেনে তুলে দিল সে। কিন্তু ততক্ষণে ডাকাতটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একলহমায় দেখে নিয়েছে তার নগ্ন বুকটা।

অকস্মাৎ কি হল। ডাকাতটা পেছনদিকে তাকিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করতেই তারা সকলেই চলে গেল বাইরে। হাতের মশালটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে সুলোচনা কিছু বুঝতে পারার আগেই হঠাৎ সেই নরপশুটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

ভয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল সুলোচনা। বাধা দেওয়ার শক্তিও ছিল না তার। আবাছা অন্ধকারে সুলোচনা শুধু অনুভব করতে পেরেছিল তার নিচের ঠোঁটটা হঠাৎ যেন জ্বালা করে উঠল। আর সাঁড়াশী দিয়ে কে যেন তার বুকের দু'পাশটা জোরে চেপে ধরেছে।

এবার চরম সর্বনাশের পালা। সুলোচনা স্পষ্ট অনুভব করতে

পারলো লালসায় উন্মত্ত সেই দানবটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দানবটার তীক্ষ্ণ নখর ছিন্ন-ভিন্ন করে চলেছে তার দেহটাকে। দারুণ এক আশঙ্কায় মনের ভয় ঝেড়ে ফেলে দু'হাতে সেই পশুটাকে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করলো সুলোচনা। কিন্তু ঐ দানব শক্তির কাছে তার নিজের শক্তি কতটকু? ক্লান্ত সুলোচনা অবশেষে এক সময় বাধ্য হলো সমস্ত প্রতিরোধ তুলে নিতে। আর ঠিক সেই সুযোগেই—

কিন্তু না, তার চরম সর্বনাশ করতে পারে নি সেই নরপশুটা। সেই মুহূর্তেই হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এল একটা বিরাট কোলাহল। গাঁয়ের লোকেরা লাঠি-বল্লম হাতে এসে জড়ো হয়েছে ডাকাতদলকে রুখতে।

সুলোচনাকে ছেড়ে দিয়ে জ্যা-ছেঁড়া ধনুকের মত হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সেই ডাকাতটা। তারপর একলাফে বাইরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গাঁয়ের লোকেরা কেউ বিশ্বাস করে নি সুলোচনার কথা। তারা নিজের চোখে তার প্রায়-অচৈতন্য দেহটাকে দেখেছে। বিশ্বাস করে নি তার স্বামীও। সে দেখেছে তার ফুলে ওঠা ঠোঁট। লক্ষ্য করেছে তার বুকের ওপর অজস্র নখের আঁচড়। তারপরও কি সে বিশ্বাস করতে পারে যে সেই নরপশুটা তার চরম সর্বনাশ করতে পারে নি?

অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিল সুলোচনা। স্বামীর গা ছুঁয়ে পর্যন্ত শপথ করেছিল। কিন্তু কিছুই টলাতে পারে নি তার স্বামীকে। তারপর প্রায় মাসদু'য়েক পরে যখন সে জানতে পারলে যে সুলোচনাব পেটে বাচ্চা এসেছে তখন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। সরাসরি অস্বীকার করল তার পেটের সন্তানকে। ছেলে তিনটিকে নিজের কাছে রেখে সুলোচনাকে পাঠিয়ে দিলে তার বাপের বাড়ি।

কিন্তু সেখানে গিয়েও নিস্তার সেই। ঢি-ঢি পড়ে গেল বাপের বাড়ির গ্রামে। অবশেষে ছ'মাসের সন্তানকে পেটে নিয়ে সে এসে আশ্রয় নিল এই দ্বীপে।

স্বাগতার জন্মের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভয়ে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছিল তার বুকটা। মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হয় তো নিয়ম অনুযায়ী ছ'বছর পর

তাকে ত্যাগ করতে হবে চিরদিনের মত। তাই একটি মেয়ের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাত সুলোচনা।

প্রার্থনা তার শুনতে পেয়েছিলেন ঈশ্বর। জন্মাল স্বাগতা। রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হবার সম্ভাবনা আর রইল না তার।

তারপর কঠিন অধ্যবসায়ে আর সরকারী উৎসাহে পড়াশোনায় মন দিয়েছিল সুলোচনা। ঐ বয়সেও একটার পর একটা পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে লাগল সে। অবশেষে তার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ পেল একটা ভাল সরকারী চাকরি। তারপর থেকেই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন। আর সেই সঙ্গে সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর একটা নিদারুণ ঘৃণার ভাব প্রবল হয়ে উঠল তার মনে।

দরজার গোড়াতেই মা-পান হেসে একেবারে জড়িয়ে ধরে স্বাগতাকে। তারপর ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করে, কেমন আছিস?

—আমি তো ভালই আছি। দু'মাস বাইরে কাটিয়ে তুই কেমন আছিস তাই আগে বল্। হেসে প্রশ্ন করে স্বাগতা।

সুন্দর বেঁটে-খাটো চেহারা বর্মী মেয়ে মা-পানের। কচি মুখে হাসি লেগে থাকে সবসময়। স্বাগতাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাব দেয়, আমিও ভালই আছি।

—তোর মা কেমন আছেন?

—একটু ভাল এখন। সরকারী হাসপাতালে আছেন।

একথা-সেকথার পর স্বাগতা আবার প্রশ্ন করে, চাকরি কেমন লাগছে?

—ভালই। জবাব দেয় মা-পান। তারপর আবার বললে, কী খাবি বল্।

—কী আবার খাব? এই তো বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি।

—তা' হোক। তবুও বল্ কী খাবি? পীড়াপীড়ি করতে থাকে মা পান।

—আচ্ছা, এককাপ চায়ের ব্যবস্থা কর শুধু। তবে, সাধারণ চা নয়। তোরা নিজেরা যেভাবে চা তৈরি করিস সেই রকম চা।

—বর্মা দেশেব চিনি-দুধ ছাড়া চা ভাল লাগে তোর? মৃদু হেসে প্রশ্ন করে মা-পান।

—হ্যাঁ, ভাল লাগে। তুই-ই একদিন খাইয়েছিলি, মনে নেই তোর?

—মাথা নেড়ে সায় দেয় মা-পান।

চা পর্বের শেষে খালি কাপটা পাশে সরিয়ে রেখে স্বাগতা আবার বললে, এবার আসল খবর বল্।

—আসল খবর? সে আবার কী? কৃত্রিম বিস্ময়ের সুর মা-পানের কণ্ঠে।

মৃদুহেসে মা-পানের টুকটুকে লাল গালটা একটু টিপে দিয়ে স্বাগতা বললে, এঃ, ন্যাকা মেয়ে, কিছুই যেন জানে না!

জবাব দেয় মা-পান, সত্যি বলছি ভাই। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বন্দরের পুরুষগুলোর কাজকর্ম দেখা ছাড়া ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত নেই। ওদেশের কোন পুরুষ আসতে পারে না আমাদের জাহাজে। একমাত্র জাহাজের ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজলদি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না শহরে। সাংঘাতিক কড়া মেয়েছেলে ক্যাপ্টেন কল্পনা।

—কিন্তু তোদের কাজলদি যেতে পারে কেন?

—বাঃ, সে তো জাহাজের ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার। জাহাজের এটা-ওটা পার্টস কিনতে তাকে যে শহরে যেতেই হবে।

মা-পানের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে স্বাগতা বললে, আচ্ছা, সত্যিকারের পুরুষগুলো কেমন দেখতে রে?

চোখে-মুখে একটা খুশির ভাব ফুটিয়ে তুলে জবাব দেয় মা-পান, চমৎকার! ওয়াণ্ডারফুল!

খুশির ভাবটা স্বাগতার মুখেও ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার বললে, তা'হলে তো তোদের সেই ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজলদিই দেখছি

ভাগ্যবতী। ভেতরে ভেতরে সে কিছু করে বসে আছে নিশ্চয়, কী বলিস? একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মা-পানের দিকে তাকায় স্বাগতা।

—কী জানি ভাই? তবে—

—তবে কী?

—মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি কাজলদি একা জাহাজের ডেকে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে অন্যমনস্ক হয়ে। চোখ দুটো তার ছল্ ছল্ করে তখন।

—তা'হলে ভাই নিশ্চয় কিছু হয়েছে, আমি জোর করে বলতে পারি।

—কী জানি ভাই। হবেও বা। এসব কথা তো আর জিজ্ঞেস করা চলে না। তা' ছাড়া সে হচ্ছে চন্দনা জাহাজের ফার্ষ্ট ইঞ্জিনীয়ার। আর আমি হচ্ছি সামান্য একজন এ্যাপ্রেন্টিস্।

স্বাগতা প্রশ্ন করে আবার, কতদিন থাকবি এখানে?

একটু ভেবে জবাব দেয় মা-পান, তা' প্রায় দশ-পনের দিন তো বটেই। জাহাজের মাল খালাস হবে, আবার বোঝাই হবে, তারপর।

একটু সময় চুপ করে থেকে স্বাগতা বললে, বিদেশ থেকে ঘুরে এলি। তা, আমার জন্যে কী এনেছিস?

—তোর জন্যে? মৃদু মৃদু হাসতে থাকে মা-পান।

—কি-রে? হাসছিস্ যে বড়? কিছুই আনিস নি আমার জন্যে?

তেমনি ভাবে মৃদুহেসে জবাব দেয় মা-পান, এনেছি, তবে জিনিসটা রাখতে পারবি তো নিজের কাছে?

—কেন পারব না? কী এনেছিস্ তাই আগে বল্।

—তবে আয় আমার সঙ্গে।

স্বাগতাকে নিয়ে মা-পান আর একটা ঘরে প্রবেশ করে। তারপর সন্তর্পণে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে একটা বড় চাম্ড়ার বাক্স খুলতে খুলতে নীচু গলায় বললে, জিনিসটা তোর খুবই পছন্দ হবে, তবে সাবধান, কেউ যেন টের না পায়। তা'হলেই সর্বনাশ।

বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মা-পান একটা বিদেশী মাসিকপত্র টেনে বের করে সেটা তুলে দেয় স্বাগতার হাতে।

বড় বড় অক্ষরে ইংরেজীতে নাম লেখা মাসিকপত্রের—ম্যাস্‌কিউলিনা। অর্থাৎ পুরুষ সম্বন্ধীয় পত্রিকা। কভারে একজন বয়স্ক ব্যক্তির ছবি।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটার পর একটা পাতা উল্টে যেতে থাকে স্বাগতা। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের পুরুষের ছবি দেখছে সে। এ রাজ্যের নিষিদ্ধ বস্তু এই ছবি। বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে তার। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অনাস্বাদিত উত্তেজনাও অনুভব করে মনে।

দেখতে দেখতে একটা পাতায় এসে দৃষ্টি আটকে যায় স্বাগতার। একজন যুবা পুরুষের একখানি রঙিন ছবি। অপূর্ব সুন্দর তার দেহকান্তি। মায়াময় দু'টো চোখ। গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার কামানো। নীচে লেখা তার পরিচয়- অভিমন্যু রায়। দেশের শ্রেষ্ঠ ভায়োলীন অর্থাৎ বেহালা বাজিয়েদের মধ্যে একজন। নিজে একজন ইঞ্জিনীয়ার। তা'ছাড়া, ছবি আঁকায়ও তার দক্ষতা প্রচুর।

বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে স্বাগতা। মা-পান তার অবস্থা দেখে হেসে ঠাট্টার সুরে বললে, কি-রে, ছবি দেখেই প্রেমে পড়ে গেলি নাকি ?

সেকথার জবাব না দিয়ে স্বাগতা চোখ তুলে মা-পানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, এই ম্যাগাজিন্‌টা কোথায় পেলি তুই ?

—ওদেশের বন্দরে জোগাড় করেছি। আমাদের জাহাজে এমিলা জোসেফ্‌ নামে একজন নিগ্রো খালাসী আছে। ঐ এমিলাই গোপনে জোগাড় করে এনে দিয়েছে আমাকে।

—সত্যি, এর চেয়ে ভাল উপহার আর হয় না। বলেই মাসিকপত্রটা ভাঁজ করে নিজের জামার মধ্যে লুকিয়ে ফেলে স্বাগতা। তারপর আবার বললে, তা'হলে ভাই এবার চলি। বাড়িতে মা একা রয়েছেন।

—আবার কবে আসবি ? প্রশ্ন করে মা-পান।

—দু'একদিন পরে। পারিস তো এর মধ্যে একবার আমাদের বাড়ি যেতে চেষ্টা করিস্, কেমন ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় মা-পান। তারপর আবার বললে, খুব সাবধানে রাখিস ওটা। পুলিশ টের পেলে কিন্তু আর রক্ষে থাকবে না। দু'জনকেই জেলে যেতে হবে।

মৃদু হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে স্বাগতা।

চোরাকারবারের রাজত্ব পৃথিবীর সর্বত্র। যেখানেই বাধা-নিষেধ, সেখানেই স্মাগ্‌লিং। বাড়ি এসে স্বাগতা সেই নিষিদ্ধ পত্রিকাটা লুকিয়ে রাখে নিজের বিছানার নীচে। প্রতিদিন গভীর রাতে পাশের ঘরে মা ঘুমিয়ে পড়লে নিজের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে বের করে সেই 'ম্যাস্‌কিউলিনা' মাসিকপত্র। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অভিমন্যু রায়ের সেই ছবিটির দিকে। মা-পান সেদিন ঠিকই বলেছিল। ছবি দেখেই ঐ অভিমন্যুকে ভালবেসে ফেলেছে স্বাগতা।

॥ পাঁচ ॥

প্রমীলা-রাজ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা নেই কোনকালে। তাই খাদ্যাভাবের দুশ্চিন্তাও নেই কর্তৃপক্ষের। বরঞ্চ লোকসংখ্যা হ্রাসের সম্ভাবনাই দেখা দিত, যদি বাইরের পৃথিবীর নারীসমাজের এখানে এসে আশ্রয় নেবার ওপর সেই দেশের কর্তৃপক্ষ কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করত। কিন্তু তা' তাঁরা করে নি। নিজেরাই যেখানে দেশের একদল নারীর সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তারা আবার তাদের এই দেশে চলে আসার ওপর কর্তৃত্ব করতে যাবে কোন্ লজ্জায় ? বরঞ্চ এশিয়া আফ্রিকার অনুন্নত সমস্যা-সঙ্কুল দেশের, বিশেষ করে লোকসংখ্যার ভারে ভারাক্রান্ত ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থাকে একটা পরোক্ষ সমাধান বলেই ধরে নিয়েছিল।

জাহাজঘাট সংলগ্ন একটা বড় বাড়ি। বাড়িটায় মাত্র দু'টো বড় বড় হল ঘর। একটি ঘর ব্যবহৃত হয় কাস্টম্‌স চেকপোস্ট হিসেবে। জাহাজ থেকে নেমে এই রাজ্যের নূতন বাসিন্দাদের কাস্টম্‌স চেকিংয়ের সম্মুখীন হতে হয়। সঙ্গে করে তারা কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য কিম্বা কোন নিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা নিয়ে এসেছে কিনা তা'ই পরীক্ষা করা হয় এখানে। অন্য ঘরটি রিসেপ্‌শন কক্ষ। কাস্টম্‌স চেকিংয়ের পর তারা এসে হাজির হয় এই ঘরে। এখানেই রাজ্যের একজন কর্মচারী দেশের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করে তাদের এদেশে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রৌঢ়া সরকারী অফিসারটির সামনে শুষ্কমুখে বসেছিল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি বিবাহিতা যুবতী—অলকা। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে—মিঠু।

অফিসারটি অলকার নাম-ধাম লিখে নিয়ে মুখ তুলে পুরু লেন্সের চশমার ফাঁকে একবার তাকায় অলকার দিকে। তারপর প্রশ্ন করে, দেশে কে আছে আপনার?

শুষ্ক মুখে একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় অলকা, কেউ নেই।

—সেকি? কেউ নেই আপনার? তারপর মিঠুকে দেখিয়ে আবার বললে, এর বাবা কোথায়?

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় অলকা, তিনি এখন দিল্লীতে। চাকরি করেন সেখানে।

—তাঁকে ছেড়ে কেন চলে এলেন এখানে? সব কথা খুলে বলুন।

নিজেকে সামলে নিতে কিছুক্ষণ সময় নেয় অলকা। একহাতে মিঠুকে জড়িয়ে ধরে নিজের আরও একটু কাছে টেনে নেয়। চোখ দুটো ছল্‌ ছল্‌ করে ওঠে একবার। তারপর ধরা গলায় বর্ণনা করতে থাকে নিজের জীবন-কাহিনী।

বিয়ের পর কলকাতায় ভাড়াবাড়িতে থাকতাম আমরা। স্বামী চাকরি করতেন পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে। বেশ সুখেই দিন কাটছিল

আমাদের। বাড়িতে একটা ঠিকে ঝি ছিল। রান্নাবান্নার কাজ নিজেই করতাম আমি।

একদিন স্বামী বললেন, ভাবছি একটা রাঁধুনির ব্যবস্থা করব।

—কেন, আবার রাঁধুনি কেন? মাত্র তো এই দু'জনের রান্না। এই সামান্য কাজ একাই করতে পারব আমি।

—তা' হোক। তোমাকে এত খাটাখাটনি করতে দেব না আমি।

আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল আমাদের। তাই স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিই নি আমি। এখন ভাবছি সেদিন বাধা দিলেই বোধহয় ভাল হত।

পরের মাসেই একটি রাঁধুনির ব্যবস্থা করলেন আমার স্বামী। ফ্রক্ পরা সেই লক্ষ্মীকে দেখে আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে ঐ অতটুকু মেয়েটা রাঁধতে পারে। কিন্তু দু'চার দিনেই টের পেলাম বয়সে ছোট হলেও মেয়েটা রান্না করে ভালই। লক্ষ্মীর বয়স তখন বড়জোর বারো কি তের। রান্নাঘরের ভার লক্ষ্মীর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম আমি।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। লক্ষ্মী তখন বড় হয়েছে। তাকে ফ্রকের বদলে শাড়ি কিনে দিয়েছি আমি। সামান্য দু'একখানা গহনাও করিয়ে দিয়েছি। ওকে সত্যিই ভালবাসতাম আমি। নিজের ছোট বোনের মতই ভালবাসতাম।

মেয়েটাও ছিল খুব শান্ত নিরীহ প্রকৃতির। কথা বলত খুবই কম। তিনকূলে ওর কেউ ছিল না। তাই বারোমাসই আমার কাছে থাকত। গায়ের রংটা ময়লা হলেও চেহারায় একটা আল্‌গা শ্রী ছিল ওর।

লক্ষ্মীকে নিয়ে আমার স্বামী সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না আমার। স্বামীকে কোনদিন অবিশ্বাস করি নি আমি। লক্ষ্মী সম্বন্ধে কোন দিন কোন বিশেষ কৌতূহলও লক্ষ্য করি নি তাঁর।

এমন সময় অফিসারটি মাথা নেড়ে বললে, ভুল করেছেন আপনি,

ঐ পুরুষ জাতটাকে মোটেই বিশ্বাস করতে নেই। ওরা পারে না এমন কোন কাজই নেই।

একটু থেমে আবার বলতে থাকে অলকা, এই মিঠুর জন্মের সময় মাস দেড়েক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল আমাকে। এ্যানিমিয়া হয়েছিল। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসে কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম লক্ষ্মীর মধ্যে। তখনও বুঝতে পারি নি আমার এই দেড়মাসের অনুপস্থিতিতেই সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার।

কিন্তু বেশিদিন চাপা রইল না ব্যাপারটা। একদিন আবিষ্কার করলাম চৌদ্দ-পনের বছরের ঐটুকু মেয়ে লক্ষ্মীর পেটে বাচ্চা এসেছে। ঘৃণায়, লজ্জায় সেদিন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করেছিল আমার। কিন্তু এই মিঠুব জন্যেই তা পারি নি সেদিন। স্বামীর ওপর এমন ঘৃণা জন্মেছিল যে মুখ ফুটে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত করি নি। কেবল সেদিন থেকে তাঁকে কাছে ঘেঁসতে দিতাম না। আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করেছিলাম তার জন্যে।

আমার স্বামী মুখে কিছু না বললেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। মাস খানেক পরে লক্ষ্মীকে তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দেবার নাম করে কোথায় যেন রেখে এলেন। ভাবলাম, আপদ বিদেয় হয়েছে। কিন্তু তখনও জানতে পারি নি আমার স্বামী তার জন্যে একটা আলাদা বাসা ঠিক করে সেখানেই রেখেছে তাকে। মাঝে মাঝে অফিসের কাজে বাইরে যাবার নাম করে সেখানেই রাত কাটিয়ে আসতেন তিনি।

লক্ষ্মী চলে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে মনটা ঠিক হয়ে এল আমার। ক্ষণিকের দুর্বলতা মনে করে ক্ষমা করেছিলাম আমার স্বামীকে।

আরও বছর তিনেক কেটে গেল তারপর। আমার স্বামী বদ্‌লি হলেন দিল্লীতে। যাবার সময় আমাদের সঙ্গে নিলেন না। বললেন, ওখানে বাসা পাওয়া খুবই কষ্টকর। তাই কিছুদিন এখানেই থাক তোমরা। শিগগিরই একটা বাসা ঠিক করে তোমাদের নিয়ে যাব

সেখানে। তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম আমি। আমাদের বাড়িওয়ালা ভাল লোক ছিলেন। তিনিই দেখাশোনা করতেন আমাদের।

ছ'মাস কেটে গেল। এর মধ্যে একবার আমার স্বামী কলকাতায়ও এসেছিলেন। বললেন, একা একা মেসে থাকতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। এদিকে বাড়ি যা' পাওয়া যায় সাংঘাতিক ভাড়া। তাই ভাবছি, আর দু'চার মাস অপেক্ষা করে তোমাদের নিয়ে গিয়ে একেবারে সরকারী কোয়ার্টারে উঠব।

সেদিনও তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম বোকার মত। প্রতি মাসে আমার কাছে টাকা পাঠাতেন তিনি। ধীরে ধীরে টাকার অঙ্ক কমতে আরম্ভ করল। অবশেষে একমাসে টাকাই পাঠালেন না তিনি।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক মেয়ের মত দেখতেন আমাকে। কাকাবাবু বলে ডাকতাম তাঁকে। তিনি একদিন বললেন, আমার তো ব্যাপারটা ঠিক ভাল ঠেকছে না, মা! আমার মনে হয় একবার তোমার নিজের যাওয়া উচিত সেখানে।

কেঁদে ফেললাম আমি। বললাম, কিন্তু আমি একা মেয়েছেলে অত দূরদেশে যাবো কী করে, কাকাবাবু?

দয়া হ'ল ভদ্রলোকের। তিনি নিজেই একদিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লী এলেন। মেসের ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে আমার স্বামী নাকি অনেকদিন আগে মেস ছেড়ে দিয়ে ভাড়া বাড়িতে উঠে গেছেন। তখনও মনে যে একটু আশা অবশিষ্ট ছিল মেস থেকে ঠিকানা নিয়ে আমার স্বামীর ভাড়াবাড়িতে গিয়ে কিন্তু সেটুকুও আর রইল না।

দরজার কড়া নাড়তেই আমার স্বামী বেরিয়ে এলেন। কোলে তাঁর মিঠুর চেয়ে বছর খানেকের ছোট একটি মেয়ে। আর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সেই লক্ষ্মী। বেশ মোটাসোটা গিন্নীবান্নীর মত দেখাচ্ছিল তাকে।

আমাদের দেখে প্রথমটায় একটু চমকে উঠেছিলেন আমার স্বামী

কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে কৈফিয়ত চাইলেন, কেন এসেছি আমরা।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমি বললাম, তবে কোথায় যাবো, বলে দাও।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন তিনি, যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। তবে এখানে নয়।

চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি। এই ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাব? নিজের বাপ-মা আগেই গত হয়েছেন। আমি ছিলাম তাঁদের একমাত্র সন্তান।

অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম তাঁকে। শেষে নিরুপায় হয়ে চোখের জলের মধ্যে এমন কথাও বললাম, আমার যা হবার হবে। এই ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভেবে অন্ততঃ ওকে তোমার কাছে রাখ।

কিন্তু তাতেও তিনি রাজি হলেন না। অগত্যা ছেলের হাত ধরে কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে চলে আসতেই আমাদের মুখের ওপর বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে সেই লক্ষ্মী।

অলকার কাহিনী শেষ হলেও তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল তখনও। সেই অফিসার মহিলাটির মুখে কিন্তু সমবেদনার পরিবর্তে পড়েছিল একটা ক্রোধের ছায়া। মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে সে বললে, অনেক বছর ধরে এই কাজ করছি। প্রতি সপ্তাহে আপনার মত অন্ততঃ একশ' দেড়শ' স্ত্রীলোকের করুণ-কাহিনী শুনতে হয় আমাকে। তাই এখন আর এসব শুনতে তেমন একটা কষ্ট হয় না। অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কেবল সাংঘাতিক ঘৃণা হয় ঐ পুরুষগুলোর ওপর। মনে হয়—

অফিসারটির কথার মধ্যেই আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে অলকা বলে ওঠে, ঐ লক্ষ্মী মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। মেয়েটা বোধহয় কিছু তুক্ করেছিল আমার স্বামীকে। নইলে আমার স্বামী তো কোনদিন এমন—

—চুপ করুন। প্রায়·ধমকে ওঠে মহিলা অফিসারটি। যত দোষ

সেই চোদ্দ-পনের বছর বয়সের মেয়েটার? আর আপনার স্বামী একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা, তাই না? আসল ব্যাপার কি জনেন, আপনার সেই স্বামী দেবতাটিই সাংঘাতিক লোভী প্রকৃতির। আপনার দেড় মাসের অনুপস্থিতিতেই ঐ কচি মেয়েটার ওপর নজর পড়েছিল তার। মেয়েটা সম্ভবত ভয়ে কিছু বলতে সাহস করে নি। আর আপনার স্বামীও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল নিশ্চিন্ত মনে। পুরুষ জাতটার স্বভাবই ঐরকম। সেই মুহূর্তে ভালমন্দ কিম্বা পরিণতি বিচার করার ক্ষমতা থাকে না তাদের। প্রবৃত্তিটাই প্রবল হয়ে ওঠে।

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে অলকা।

মহিলা অফিসারটি আবার বললে, আপনার এই ছেলের বয়স কত?

—এই চার চলছে।

—কোন সার্টিফিকেট আছে?

—হ্যাঁ আছে। বলেই অলকা আঁচল খুলে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দেয়।

কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অফিসারটি বললে, আপনি জানেন, আপনার এই ছেলের বয়স যখন ছ'বছর পূর্ণ হবে তখন তাকে চিরদিনের মত চলে যেতে হবে আপনার কাছ থেকে?

মুখে কোন জবাব দেয় না অলকা। শুকমুখে একটা ঢোক গেলে কেবল।

—কী, চুপ করে রইলেন কেন? শোনেন নি এ কথা?

—হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু—

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না এদেশে।

—কিন্তু এইটুকু ছেলে যাবে কোথায়? থাকবে কার কাছে?

—ওর আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ওকে। আর আত্মীয়-স্বজন না থাকলে রেখে আসা হবে কোন অনাথ আশ্রমে।

—সেখানে কি ও মানুষ হবে?

—সে ভাবনা আমাদের নয়। ওর ভাগ্য সেটা। তবে—

—তবে কি? উৎসুক কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে অলকা।

—তবে যদি আপনি ওব জন্যে কিছু খরচপত্র করতে চান তো তারও ব্যবস্থা করা যেতে পাবে।

—কি রকম? ঔৎসুক্য দেখায় অলকা।

—এ দেশে কেউ বসে থাকতে পারে না। কিছু না কিছু কাজ সবাইকেই করতে হয়। এই ধরুন আপনার কথা—আপনাকেও আপনার বিদ্যাবুদ্ধি, ক্ষমতা অনুযায়ী কোন কাজ করতে হবে। তা সে ফ্যাক্টরীতে হোক্, কিম্বা সরকারী দপ্তরখানায়ই হোক্। অবশ্যি তার বিনিময়ে আপনি যা রোজগার করবেন তাতে আপনি খুবই ভালমত থাকতে পারবেন এ দেশে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন তবে আপনার ঐ আয় থেকে একটা অংশ পাঠাতে পারেন আপনার ছেলের জন্যে। অবশ্যি এ দেশের সঙ্গে বাইরের কোন দেশের চিঠিপত্রের কিম্বা মানি-অর্ডারের আদান-প্রদান হয় না। যা কিছু সামান্য হয় তা কেবল সরকারী স্তরে। সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সরকারী মাধ্যমেই ঐ টাকা পাঠাতে পারবেন আপনি।

এতক্ষণে যেন একটু আশার আলো দেখতে পায় অলকা। নাই-বা সে দেখতে পেল ছেলেকে কোনদিন, তবু মানুষ তো হবে মিঠু। আর দশজনের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে সে সংসারে। অর্থাভাবে মূর্খ হয়ে থাকতে হবে না তাকে। এইটুকুই মাত্র চেয়েছিল অলকা। তার নিজের জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল মিঠুর জন্যেই তার চিন্তা। সেই মিঠুকেই যদি সে মানুষ করে তুলতে পারে তো আর কী চাই তার? এর বেশি আর কি আশা করতে পারে সে?

॥ ছয় ॥

জাহাজটার নাম এস্ এস্ চন্দনা। বিশ হাজার টনী মালবাহী জাহাজ। প্রচুর লোকজন, ইঞ্জিনীয়ার খালাসী। কিন্তু সকলেই নারী। দ্বীপের রপ্তানিযোগ্য মালপত্র নিয়ে চন্দনা পাড়ি দেয় বিদেশে—সেই একশ মাইল দূরে মেন্ ল্যাণ্ডের বন্দরে। আবার ঐ দেশ থেকে নিয়ে আসে আমদানীযোগ্য মাল, যা নাকি এই দ্বীপে তেমন মেলে না। তাঁতের মাকুর মত এই যাতায়াত করাই চন্দনার কাজ।

চন্দনার অধ্যক্ষ অর্থাৎ ক্যাপ্টেন কল্পনা অভিজ্ঞা মহিলা। সমস্ত জীবনটাই সমুদ্রের জলে কেটেছে তার। যেমন রাশভারি তেমনি কড়া মেজাজের মহিলা।

এই জাহাজেই নতুন চাকরী নিয়ে এসেছে বর্মী তরুণী মা-পান। কৈশোরের চঞ্চলতা কাটিয়ে সবে পা দিয়েছে যৌবনে। এখনও শিক্ষানবীশ—এ্যাপ্রেন্টিস্ ইঞ্জিনীয়ার। আর আছে নিগ্রো খালাসী এমিলা জোসেফ। কালো কুচকুচে গায়ের রং। ভারিক্কী চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। এমিলা এখন আর ঠিক খালাসী নয়—খালাসীদের সর্দারণী। অন্য খালাসী স্ত্রীলোকেরা বাঘের মত ভয় করে তাকে।

সংসারে এমন এক জাতের লোক দেখা যায় যাদের দেখামাত্র ভাল লাগে সকলের। চন্দনা জাহাজের ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজল হচ্ছে সেই জাতের নারী। জাহাজের প্রতিটি কর্মচারী পছন্দ করে তাকে। প্রতিটি নাবিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় তার। বয়সে অনেকের চেয়ে ছোট হলেও সে হচ্ছে সার্বজনীন কাজলদি। বিপদে-আপদে এই কাজলদি সবসময়ই হাজির। সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। প্রচণ্ড ঝড়। কাগজের নৌকোর মত বিশাল সমুদ্রে জাহাজ প্রায় ডুবুডুবু। ইঞ্জিনঘরে জল ঢুকেছে। বয়লারের অবস্থা সঙ্গীন। এমনি সময়

চিন্তিত ক্যাপ্টেন কল্পনা যার সঙ্গে পরামর্শ করে সে হচ্ছে কাজল। কোন নাবিক হয়ত জাহাজের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জাহাজের ফার্স্ট নার্স আর মেয়ে ডাক্তার তার পরিচর্যায় রত। সেখানেও ঠিক হাজির আছে কাজল—হয়ত রোগিণীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কিম্বা আইস্‌ব্যাগ্‌ দিচ্ছে তার মাথায়। জাহাজের মধ্যেই কোন উৎসব রজনীর গানের আসরে যার মিষ্টি কণ্ঠস্বর সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় সেও কাজল ছাড়া আর কেউ নয়। ক্যাপ্টেন কল্পনা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে কাজলকে বলে—ভার্সেটাইল জীনিয়াস্‌!

পঁচিশ-ছাব্বিশের মত বয়স হবে কাজলের। প্রমীলা-দ্বীপের মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার কাজল। স্কুল-কলেজ-জীবনের চৌখস ছাত্রী কাজল সম্ভবত রেকর্ড সময়ের মধ্যে একটা প্রথম শ্রেণীর জাহাজের ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ারের আসনে বসতে পেরেছে।

জাহাজের কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম কাজল। তার বেলা কোন বাধানিষেধ নেই। স্বয়ং ক্যাপ্টেন পর্যন্ত জাহাজ ছেড়ে বন্দরের মাটিতে পা দেয় না। কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা করা কিম্বা কথা বলা তো দূরের কথা। বন্দরের অন্য জাহাজের পুরুষ ক্যাপ্টেনের দল চন্দনার এই নারী ক্যাপ্টেন সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী। দু-একবার তারা চেষ্টাও করেছে তার সঙ্গে আলাপ করতে—নেহাৎ সৌজন্যমূলক আলাপ। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে আর বেশি দূর এগোয় নি। অত্যন্ত শৃঙ্খলাপ্রিয় মহিলা ক্যাপ্টেন কল্পনা। নিজের দেশের আইনকানুন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। তা'ছাড়া, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের দেশের বহু স্ত্রীলোকের মত সে নিজেও যে মনোভাবের অধিকারিনী তার নাম পুরুষ-বিদ্বেষ।

কিন্তু ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজলের বেলা এ নিয়ম খাটে না। তাকে বাইরে যেতে হবেই। সমুদ্রযাত্রায় চন্দনার এটা-ওটা খারাপ

হয়ে যায় যখন—তখন। বন্দরে এসে মেরামত করে নিতে হয়। তাই স্পেয়ার পার্টস্ কিনতে শহরের জাহাজী মালের বেচাকেনার কেন্দ্রে ঘোরাফেরা করতে হয় তাকে। তবে, তাকে নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা নেই ক্যাপ্টেন কল্পনার। সে তাকে খুবই বিশ্বাস করে। অনেকদিন অনেকভাবে পরীক্ষা করে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে যে কাজল নিজের দেশের আইনকানুনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। উগ্রতা না থাকলেও সে যথেষ্টই পুরুষ-বিদ্বেষী।

বাস্তবিকই তাই। বন্দরে কিম্বা শহরে ঘোরাফেরা করলেও নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন পুরুষের সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত বলে না কাজল। মেলামেশা করা তো দূরের কথা। কিন্তু বিধি বাম হলে যেমন অনেক অঘটনই ঘটে থাকে সংসারে, তেমনি কে কবে কোথায় কীভাবে পঞ্চশরে বিদ্ধ হবে তাও আগে থাকতে হিসেব করে রাখা চলে না।

কাজল নিজেও প্রথম দিকে তেমন কিছু বুঝতে পারে নি। ভেবেছিল ব্যাপারটা নিছক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আসল ব্যাপারটা টের পেয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মনের সেই ছেড়ে দেওয়া লাগামটাকে টেনে রাখা তখন বাস্তবিকই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে।

চন্দনা যেদিন যাত্রা শেষ করে মেন্ ল্যাণ্ডের বন্দরে এসে ভিড়ল সেদিন রাতেই নিজের কেবিনে অসুস্থ হয়ে পড়ল ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজল। দারুণ জ্বর। আর সেই সঙ্গে ডিলিরিয়াম্। ছুটে এল জাহাজের মেয়ে ডাক্তার, নার্স। ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন কল্পনা। চলল চিকিৎসা। কিন্তু দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা চিকিৎসার পরও রোগীর কিছুমাত্র উন্নতি হ'ল না। লেডী ডাক্তার চিন্তিত মুখে ক্যাপ্টেনকে জানাল, আমার মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া।

—তা'হলে উপায়? শহরের অন্য কোন লেডী ডাক্তারকে কল্ দেব কী? চিন্তিত কণ্ঠস্বর ক্যাপ্টেন কল্পনার।

একমুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দেয় ডাক্তার, আমার মনে হয় ওতে কেবল সময় নষ্ট হবে। তার চেয়ে ওকে এখনই কোন হস্‌পিট্যালে বিমুভ করা উচিত।

কিন্তু কেবলমাত্র মেয়েদের জন্যে কোন হাসপাতাল নেই এখানে। তাই বাধ্য হয়ে কাজলকে পাঠাতে হল শহরের বড় হাসপাতালে— অবশ্যি ফিমেল ওয়ার্ডে।

কাজলকে দিন পনের থাকতে হয়েছিল হাসপাতালে। এই পনেরদিন মালপত্র বোঝাই হয়ে চন্দনাও অপেক্ষা করছিল বন্দরে। মাঝে মধ্যে ক্যাপ্টেন কল্পনা হাসপাতালে আসত কাজলকে দেখতে। একদিন অবশ্যি এ্যাপ্রেন্টিস্ মা-পানকেও সঙ্গে এনেছিল। বেতার মারফত খবর গেল দেশে—ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার অসুস্থ। দেশে ফিরতে দেরি হবে।

এই হাসপাতালেই কাজলের আলাপ হয়েছিল ডক্টর সোমনাথের সঙ্গে। তিরিশ বছরের দীর্ঘ সবল সোমনাথের রংটা অবশ্যি তেমন ফর্সা নয়। কিন্তু চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। ডাক্তার হিসেবে বিশেষ করে মেডিসিনে প্রচুর সুনাম সোমনাথের। তা'ছাড়া আরও একটি গুণ ছিল তার। কথা বলার ঢংটি তার বাস্তবিকই সুন্দর। মা সরস্বতী যেন সর্বক্ষণ লেগে রয়েছেন তার ঠোঁটের সঙ্গে। শুধুমাত্র কথা বলে যে মানুষকে আকৃষ্ট করা যায় তা' ডক্টর সোমনাথকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

কাজল ছিল সোমনাথেরই পেশেন্ট। প্রথমদিকে জ্বরের ঘোরে জ্ঞানই ছিল না কাজলের। তারপর, জ্ঞান হলেই দেখতে পেয়েছিল তার মাথার কাছে সেই দীর্ঘাকৃতি পুরুষকে। মুখে তার মিষ্টি অভয়বাণী, কোন চিন্তা নেই আপনার। শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবেন।

বিদেশের এক হাসপাতালে শুয়ে সেদিন ডক্টর সোমনাথের সেই অভয়-বাণীই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল কাজল। এই ব্যক্তিকেই সেদিন অত্যন্ত আপন বলে মনে হয়েছিল তার।

তারপর প্রতিদিন দু'বার করে তাকে দেখতে এসেছে সোমনাথ। পরীক্ষা করেছে তাকে, ওষুধ দিয়েছে, নির্দেশ দিয়ে গেছে নার্সকে। হাতে সময় থাকলে দু'মিনিট সামনে বসে কথা বলেছে তার সঙ্গে। তারপর, যাবার সময় মিষ্টি হেসে বলে গেছে, কাল সকালে এসে কিন্তু দেখতে চাই আপনি আরও ভাল হয়ে উঠেছেন, কেমন ?

ম্লান হেসে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে কাজল। ঘাড় ফিরিয়ে সোমনাথকে দেখেছে যতক্ষণ না সে দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই নার্সকে দেখে লজ্জা পেয়ে ঘাড় সোজা করে চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে থেকেছে নিজের বিছানায়।

নার্স কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছে, ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়েছিলেন কেন ? কিছু বলার ছিল নাকি আপনার ?

মনে মনে আরও লজ্জা পেয়ে জবাব দিয়েছে কাজল, না না, তেমন কিছু নয়— ।

সোমনাথের যেদিন আসতে একটু দেরি হয়েছে মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়েছে কাজল। নিজেকে সামলে রাখতে গিয়ে একসময় হয়ত মুখ ফস্কে জিজ্ঞেস করেই ফেলেছে নার্সকে, ডাক্তারবাবু কি আজ আসবেন না ?

মুচ্‌কি হেসে জবাব দিয়েছে নার্স, অত উতলা কেন ? না এসে যাবেন কোথায় তিনি ? বলেই হয়ত একটু জোরেই হেসে উঠেছে। আরও লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেছে কাজল।

নার্স হলেও সে স্ত্রীলোক তো বটে। এই ক'দিনেই সে লক্ষ্য করেছে, ডক্টর সোমনাথের যেন তার এই পেশেণ্টটির দিকে একটু বেশি নজর। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকৃতি-দেবী তাঁর নিজের কাজ করে গেছেন নিপুণভাবে। পঞ্চশরে আহত হয়েছে কাজল। আর সম্ভবত ডক্টব সোমনাথ নিজেও।

হাসপাতাল থেকে যেদিন ছুটি পেল সেদিন মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল কাজলের। আগের দিন রাতে ডক্টর সোমনাথ তাকে

ফাইন্যাল পরীক্ষা করে বলেছিল, আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। কাল সকালেই আপনার ছুটি।

বুদ্ধিমতী নার্সটি তখন কেবিন ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। সেই রাতে কিন্তু ডাক্তারের মুখে ছুটির কথা শুনেও তেমন উৎসাহিত হয়ে ওঠে নি কাজল। মৃদুকণ্ঠে শুধু বলেছিল, আপনার তো ভালই হ'ল।

—আমার ভাল হ'ল কেন?

—তা' নয় তো কী? আপনারা ডাক্তারেরা তো রোগীকে তাড়াতে পারলেই বাঁচেন, অবশ্যি তাকে সারিয়ে তুলে।

দু'দিকেই কাটে কথাটা। সেই সূক্ষ্ম অর্থটুকু বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় নি সোমনাথের। হেসে জবাব দিয়েছিল, তা' বটে। কিন্তু তার সেই হাসির মধ্যে কেবল নিখাদ হাসি ছাড়া আরও যে কিছু লুকিয়েছিল তা' নারীর স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল কাজলের চোখে। কেমন যেন একটা ব্যথায় মনটা ব্যথিত হয়ে উঠেছিল তার। এই বেদনা আগে কোনদিন উপলব্ধি করে নি সে।

সেদিন রাতে নিজের কাজ ফেলে রেখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজলের কেবিনে কাটিয়েছিল ডক্টর সোমনাথ।

সেই থেকেই শুরু। তারপর প্রতিবার এই মেন-ল্যাণ্ডে এসে নিজের কাজের ফাঁকে কাজল দেখা করেছে সোমনাথের সঙ্গে। প্রথম প্রথম নিজের মনকে ভুলোতে চেষ্টা করত এই বলে যে, এটা কেবল তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু অল্পদিনেই নিজের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল কাজল। মনের আয়নায় নিজেকে দেখে সেদিন চমকে উঠেছিল। ভয় পেয়েছিল—আতঙ্কিত হয়েছিল। মনে মনে বলেছিল, এ কী করতে চলেছে সে? কোথায় এর পরিণতি? লাগাম টেনে মনের গতিকে ফেরাতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তার সমস্ত প্রচেষ্টা। অবশেষে নিজের ভাগ্যের হাতেই সমর্পণ করতে হয়েছিল নিজেকে।

হাসপাতালে কাজের ফাঁকে কাজলকে নিয়ে গাড়ি করে সোমনাথ চলে যেত কোন নির্জন পার্কে কিম্বা নদীর ধারে। মন দেওয়া-নেওয়ার পালা চলত তাদের সেখানে। এক এক সময় সচকিত হয়ে উঠত কাজল। বলত, জানো মাঝে মাঝে দারুণ ভয় করে আমার।

—কীসের ভয়? প্রশ্ন করত সোমনাথ।

একটু দ্বিধা করে জবাব দিত কাজল, যদি কোনদিন ধরা পড়ে যাই? যদি কোনদিন এদেশে আসা বন্ধ হয়ে যায় আমার?

একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলত সোমনাথ, তাই ভাবছ নাকি? কিন্তু তার আগেই তোমাকে আত্মসাৎ করে ফেলব আমি।

—কিন্তু যদি কোনরকম সন্দেহ করে আমায় দেশে আটকে দেয় তারা?

দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে জবাব দিত সোমনাথ, তার আগেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে। তোমাকে আর যেতেই দেব না সেখানে।

মুখখানা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে উঠত কাজলের। দেশ ছেড়ে চিরদিনের মত চলে আসার কথায় চিন্তিত হয়ে উঠত সে। বলত, সেখানে আমার মা আছেন। বুড়োমানুষ। তাঁকে ছেড়ে এখানে চলে আসব কী করে?

এ প্রশ্নের আর জবাব দিত না সোমনাথ। কিন্তু সারামুখে একটা নিশ্চিন্ততার ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে আরও একটু কাছে টেনে নিত কাজলকে।

—আপনি আজকাল বড়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। কথাটা সেদিন বলেছিল ক্যাপ্টেন কল্পনা। কাজলের সঙ্গে জাহাজের ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বলে ফেলেছিল কথাটা।

চকিতে মুখ ফিরিয়ে লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল কাজল, না—না, ঠিক তা নয়। তবে—

এমনি ধরনের একটা কথা সেদিন মা-পানও বলেছিল কাজলকে।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল কাজল। কখন মা-পান এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল টের পায় নি। মা-পান মৃদু কণ্ঠে ডাকতেই চম্‌কে তাকিয়েছিল কাজল। বলেছিল মা-পান্, এত কী ভাবেন কাজলদি? কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছেন আজকাল।

মনের উদ্বেগ মনেই চেপে রেখে জোর করে একটু হেসে বলেছিল কাজল, না—না, এই সমুদ্র দেখছিলাম আর কি?

চিন্তাভাবনার যথেষ্টই কারণ ছিল কাজলের। আগের বারে সোমনাথ তাকে জানিয়েছে, আর দেরি করবে না সে কিছুতেই। পরের বারে ফিরে এলেই সে বিয়ের ব্যবস্থা করবে। এবার ফিরে এসে সোমনাথের সঙ্গে দেখা করতেই সোমনাথ তাকে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

সোমনাথের কথায় সেদিন সায় দিতে পারে নি কাজল। আবার না বলতেও পারে নি। একদিকে সোমনাথের উৎসাহ, অন্য দিকে তার নিজের ভয়। সোমনাথ অবশ্যি বলেছিল, বিয়ের পর কাজল তার কাছেই থেকে যাবে। দেশে আর ফিরবে না। তাতে আর যাই হোক না কেন, সেই প্রমীলা রাজ্যের কর্তৃপক্ষ জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না তাকে।

কিন্তু কাজলের দুশ্চিন্তা ছিল তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে। এই বয়সে তাঁকে একা ফেলে রেখে দেশত্যাগী হয়ে স্বামীর কাছে থাকতে বিবেকে বাধছিল তার।

সেদিন সুযোগ বুঝে জাহাজের মালপত্র কেনাকাটার নাম করে সোজা সোমনাথের কোয়ার্টারে এসে হাজির হয়েছিল কাজল।

প্যাণ্ট-সার্ট পরে প্রস্তুত হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল সোমনাথ। এমনি সময় কাজলকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে। বললে, এসে গেছ? তোমার পথ চেয়েই অপেক্ষা করছিলাম। এদিকের সব প্রস্তুত। এখানেই—এই বাড়িতেই বিয়ে হবে। আমার মা তো নেই। দেশের বাড়িতে বাবা আছেন। তাঁরও অনুমতি নিয়েছি। খবর পেলেই চলে আসবেন তিনি। আর পুরুত ঠাকুর—

আনন্দের আতিশয্যে নিজের কথাই বলে চলেছিল সোমনাথ। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে, কাজলের মুখখানা যেন কেমন গম্ভীর। তাই কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে একটু সময় পরে সে আবার বললে, তুমি এত গম্ভীর কেন? কেমন যেন শুকনো লাগছে তোমাকে। অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

ম্লান হেসে জবাব দেয় কাজল, না। শরীর আমার ভালই আছে। তবে—

—তবে কি? প্রশ্ন করে সোমনাথ।

একমুহূর্ত চুপ্ করে থাকে কাজল। সোমনাথের একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়। মুখ তুলে সজল চোখে একবার তাকায় তার মুখের দিকে। তারপর তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ভীরুকণ্ঠে বললে, বড্ড ভয় করছে আমার, তা' ছাড়া আমার বুড়ো মাকে ছেড়ে—

কথার মাঝখানেই কাজলকে থামিয়ে সোমনাথ বলে ওঠে, আচ্ছা তুমি আমাকে কী ভাব বল তো? আমার মনটা কি পাথর? তোমার ঐ বুড়ো মাকে ছেড়ে এসে তোমাকে এখানে থাকতে বলতে পারি আমি? বিয়ের পরের দিনই তুমি চলে যাবে তোমার জাহাজে। বিয়ের কথা গোপন থাকবে। এখানে যখন তুমি আসবে, তখন গোপনে মিলিত হব আমরা। সময় হলে আবার চলে যাবে তুমি। এমনিভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন কাটবে যতদিন তোমার মা বেঁচে থাকবেন।

একটা খুশীর ঝলক্ জেগে ওঠে কাজলের চোখেমুখে। নিজেকে বঞ্চিত করে সোমনাথ যে এমনি একটা ব্যবস্থা করবে কেবল তারই মুখ চেয়ে তা' সে ধারণাই করতে পারে নি। আবেশকাতর কণ্ঠে সে শুধু বললে, এতে তোমার কষ্ট হবে না?

—কষ্ট? মৃদু হাসে সোমনাথ, তোমার জন্যে এইটুকু কষ্ট করতে পারবো না আমি?

গভীর আবেগে বাক্যস্ফুরণ হয় না কাজলের। সোমনাথের হাতটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে হৃদয়াবেগ সংবরণ করতে চেষ্টা করে খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকে কাজল। তারপর বিহ্বল চোখ দুটি মেলে সোমনাথের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, তুমি—তুমি মানুষ, না দেবতা ?

কাজলের কেবিনে প্রবেশ করে বর্মী-মেয়ে মা-পান্ জিজ্ঞেস করে, আপনি আমায় ডেকেছিলেন, কাজলদি ?

—হ্যাঁ, ভাই। তোমাকে ডেকেছিলাম একটু বিশেষ কাজে। ঐ চেয়ারটায় বস।

নিজের বিছানায় বসেছিল কাজল। মা-পান্ চেয়ারে বসতেই কাজল উঠে গিয়ে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে দেয় ভেতর থেকে। তারপর ফিরে এসে আর একটা চেয়ারে বসে মা-পানের দিকে তাকিয়ে নীচু কণ্ঠে বললে, একটা গোপনীয় কথা বলবার জন্যেই ডেকেছি তোমাকে। খুবই গোপনীয় কথাটা। এর ওপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

—কী কথা, কাজলদি ? উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে মা-পান্।

—আমাকে সাহায্য করতে হবে। জবাব দেয় কাজল।

—আপনাকে সাহায্য করব আমি ? সেকি ? যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না মা-পান্।

—হ্যাঁ, তোমার সাহায্যই আমার চাই। এক-মুহূর্ত চুপ্ করে থেকে মা-পানের শান্ত সরল মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় কাজল। তারপর আবার বললে, আজ রাতে আমার বিয়ে।

হঠাৎ যেন কেবিনের ছাদটা মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে আচম্কা। অকস্মাৎ যেন কেবিনের মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিস্মিত স্তব্ধ মা-পান্ বোবা দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে কাজলের মুখের দিকে।

শান্তকণ্ঠে কাজল বলে যায় তার পূর্বরাগের কাহিনী। তারপর

আবার বললে, আজ রাতেই বিয়ে হবে আমাদের। তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

বুকের ভেতর হাতুড়ী পিট্‌ছে মা-পানের। একটা নিষিদ্ধ জগতের খবর দিচ্ছে কাজলদি। ব্যাপারটা শুধুমাত্র চিন্তা করতেই গায়ে রোমাঞ্চ লাগে। কাজলদির বিয়ে—একজন সত্যিকারের পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। সহসা বিশ্বাস করতে মন চায় না এমন একটা কথা। কিন্তু বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। কাজলদি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন না তার সঙ্গে।

কাজল আবার বললে, অবাক্ হবার মতই কথা বটে! কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। তারপর একটু থেমে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে আবার বললে, ডিউটি রোস্‌টারে আজ রাতে তোমারই নাইট্ ডিউটির ব্যবস্থা করেছি। অন্য নাবিক-পাহারাদারদের চার্জে থাকবে তুমি। আজ বিকেলে আমার এই কেবিনের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে সবার অলক্ষ্যে আমি চলে যাব। রাত আটটায় রোলকলের সময় তুমি ক্যাপ্টেনকে জানাবে যে আমার খুব মাথা ধরেছে। তাই আমি আমার কেবিনেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়েছি। ক্যাপ্টেন আমাকে দেখতে আসতে চাইলে তুমি তাঁকে জানাবে যে আমি বলেছি কেউ যেন আমাকে ডিস্‌টার্ব না করে। রাত আটটায় রোলকলের পর জাহাজের সিঁড়ি তুলে নিয়ে মেন্ গেট বন্ধ হয়ে যায়। গেটের চাবি থাকবে তোমার কাছে। অন্য নাবিকদের জাহাজের অন্যপাশে পোস্টিং করে তুমি নিজে থাকবে মেন্ গেটের কাছে। শেষরাতে আমি এসে হাজির হব। সন্তর্পণে গেট্ খুলে দিয়ে জাহাজের সিঁড়ি নামিয়ে দেবে আমার জন্যে।

কাজল থামতেই মা-পান্ বললে, কিন্তু কেউ যদি কিছু সন্দেহ করে?

—কী করে সন্দেহ করবে? আমার কথামত ঠিক্ ঠিক্ কাজগুলো যদি করতে পার তো কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।

একটু সময় চিন্তা করে রাজি হয় মা-পান্। কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে ওঠে কাজলের।

বিয়েবাড়িতে কিন্তু লোকজনের ভিড় নেই, আলোর রোশনাই নেই। নেই হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি। কেমন যেন চুপচাপ। সোমনাথের বাবা এসেছেন। আর এসেছে সোমনাথের একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন ও তাদের স্ত্রীরা। অতি সংক্ষিপ্ত বিয়ের আয়োজন।

অনুষ্ঠানের কিন্তু ত্রুটি রইল না একটুও। শুভদৃষ্টি হল, মালাবদল হল। স্পষ্ট উচ্চারণে বিয়ের মন্ত্র পাঠ করল সোমনাথ। কুশণ্ডিকাও শেষ হ'ল সেই রাতে। শাস্ত্রমতে পুরুতঠাকুর নিজেই কাজলকে কন্যারূপে গ্রহণ করে তাকে দান করলেন সোমনাথের হাতে।

অনুষ্ঠান শেষে জলযোগের পর বিহ্বলা কাজলকে বাসরঘরে ঠেলে দিয়ে সোমনাথের বন্ধু ও তাদের স্ত্রীরা বিদায় নিলে হাসিমুখে।

মানুষের জীবনে যে এত সুখ, এত আনন্দ থাকতে পারে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কাজল। একজন পুরুষকে একান্তভাবে পাওয়ার মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ লুকিয়ে থাকে তা' যেন কল্পনাই করতে পারছিল না সে। আজ থেকে তার পাশে শুয়ে থাকা ঐ লোকটি তার স্বামী—তার একান্ত আপন। দাম্পত্যজীবনে পাওয়ার চাইতেও দিয়ে যে এত সুখ তা' যেন সেই প্রথম রাতেই টের পেয়েছিল কাজল। ক্লান্তির আবেশে চোখ দুটো জড়িয়ে এলেও ঘুমোতে পারে নি তারা। সারারাত কথা বলেছিল। কাজলকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল সোমনাথ, পারবে তো আমাকে ছেড়ে থাকতে?

মুখে জবাব না দিয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়েছিল কাজল।

শেষ রাতেই কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে তারা। এবার যেতে হবে কাজলকে।

বাইরে তখনও অন্ধকার। আকাশের এককোণে শুকতারাটা

কেবল মিট্ মিট্ করছে। প্রস্তুত হয় কাজল। সোমনাথ একবার তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, সিঁথির সিঁদুর ঢাকবে কী দিয়ে ?

একটু ম্লান হাসে কাজল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, আজ থেকে আমার মাথায় দু'টো সিঁথির সৃষ্টি হল। একটা সিঁথিতে থাকবে তোমার দেওয়া সিঁদুর। সেটা থাকবে চুলে ঢাকা। অন্যটা আমার কুমারী জীবনের সিঁথি। সিঁদুরের লেশমাত্র থাকবে না তাতে।

বাস্তবিকই তাই। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিপুণ হাতে ঘন চুলের মধ্যে কাজল লুকিয়ে ফেলে তার সিঁদুর। তারপর প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ায় সোমনাথের সামনে। সোমনাথ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরীক্ষা করে তাকে। তারপর বললে, না, বিয়ের কোন চিহ্নই আর রইল না তোমার দেহে, এবার তা'হলে চল।

নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল সোমনাথ। পাশে বসে তার ঘণ্টাকয়েক আগের পরিণীতা বধূ। কথা বলতে পারছিল না কাজল। কেবল মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল স্বামীর মুখের দিকে। একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে মনটা পূর্ণ হয়ে রয়েছিল তার। একদিকে একরাতের দাম্পত্যজীবন, অন্যদিকে একটা দারুণ ভয়, আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা। একদিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ। সেই বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে কেবল বিহ্বল হয়ে বসেছিল কাজল। অনেক কিছুই তার বলার ছিল সোমনাথকে, কিন্তু কিছুই বলা হ'ল না।

একসময় গাড়িটা এসে দাঁড়ায় বন্দর এলাকায়। সামান্য দূরে সমুদ্রের বুকে ভাসছে নোঙর-করা জাহাজগুলো—আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট।

গাড়ি থেকে নেমে এসে দু'জনে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায়। একটিমাত্র মুহূর্ত। দুজনেই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দু'জনার দিকে। পরমুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে দ্রুতপদে জাহাজের দিকে এগিয়ে যায় কাজল। গাড়ির খোলা দরজায় একটা হাত রেখে নবপরিণীতা বধূর অপসৃয়মান দেহটার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সোমনাথ।

একটু আশ্চর্য হয় কাজল। বর্মী মেয়েটার সাহস তো কম নয়।

আগে থেকেই জাহাজের মেন্ গেট খুলে সিঁড়ি নামিয়ে দিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ! কেউ যদি দেখে ফেলে !

নিশ্চিন্ত মনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে কাজল। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। একবার নিজের কেবিনে ঢুকতে পারলে আর চিন্তা কী ! কিন্তু মা-পান্ কোথায় ? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না।

জাহাজের মৃদু আলোয় ডেকটা স্বল্প আলোকিত। সেই আলো-আঁধারির মধ্যে এসে দাঁড়ায় কাজল। কেউ কোথাও নেই। কোথায় গেল মা-পান্ ?

একমুহূর্ত চিন্তা করে কাজল। তারপর লঘু পায়ে এসে দাঁড়ায় নিজের কেবিনের সামনে।

সবে কেবিনের দরজায় কাজল হাত রেখেছে, অকস্মাৎ পেছনে কল্পনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে, কোথায় ছিলেন আপনি ?

দারুণ চমকে ওঠে কাজল। কী বলবে, কী করবে যেন বুঝতে পারে না সেই মুহূর্তে। একবার মনে হয় সোজা দৌড়ে পালায়। কিন্তু পালাবে কোথায় ?

অন্ধকার ভেদ্ করে ততক্ষণে ক্যাপ্টেন কল্পনা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। কী, কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন ? কোথায় কাটিয়ে এলেন রাতটা ?

দেহে যেন এতটুকু শক্তি নেই কাজলের। কে যেন তার সবটুকু শক্তি শুষে নিয়েছে। ধরা পড়ে গেছে সে। নিদারুণভাবে ফাঁস হয়ে গেছে তার পরিকল্পনা। আর রক্ষে নেই তার। কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, আর বোধহয় কোনদিন সে আসতে পারবে না এদেশে। কোনদিন আর দেখা হবে না সোমনাথের সঙ্গে। কথাটা চিন্তা করতেও মাথাটা ঘুরে ওঠে কাজলের।

তবে কি মা-পান্ নিজেই বেইমানী করেছে ? তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচনা করেছে সেই বর্মী মেয়েটা ?

শুষ্ককণ্ঠে একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় কাজল, আমার এক বান্ধবীর কাছে—

—মিথ্যেকথা, গর্জে ওঠে কল্পনা, বাইরে রাত কাটাবার হুকুম কে দিয়েছে আপনাকে ? দেশের আইন লঙ্ঘন করে কোন্ সাহসে আপনি এ কাজ করলেন ?

জবাব দিতে পারে না কাজল। ক্যাপ্টেন কল্পনা আবার বলতে থাকে, ছি—ছি, একটা সরল মেয়েকে দিয়ে মিথ্যে খবর পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে ! কিন্তু আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি এতই সহজ মনে করেছেন ? বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন আমার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে আপনার কেবিনের দরজা খুলে দেখলাম ঘর ফাঁকা। আপনি নেই।

এতক্ষণে কাজল বুঝতে পারে মা-পান্ কিছু বলে নি। বরাত খারাপ বলেই সে ধরা পড়েছে। তবে ক্যাপ্টেনের কথায় মনে হয় আসল খবর কিছুই জানতে পারে নি সে। তার বিয়ের ব্যাপার কিছুই টের পায় নি কল্পনা।

—কিন্তু—কিন্তু মা-পান্ সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমিই তাকে মিথ্যে খবর দিতে বলেছিলাম। মা-পানকে বাঁচাতে গিয়ে এবার সত্যিকথা বলে ফেলে কাজল। ধরা পড়ে গিয়ে নিজের অপরাধ স্খালনের আর প্রবৃত্তি হয় না তার।

জবাব দেয় কল্পনা, তা' আমি জানি। মা-পানকে মিথ্যে বলেছেন সে বেচারা সরলমনে খবরটা দিয়েছিল আমাকে। একটু সময় থেমে কল্পনা দৃঢ়কণ্ঠে আবার বললে, এই মুহূর্ত থেকে সাময়িকভাবে আপনাকে বরখাস্ত করা হ'ল। দেশে ফিরে গিয়ে বিচার হবে আপনার। তার আগে আপনার নিজের কেবিনেই আবদ্ধ থাকতে হবে আপনাকে কাল সকালেই সাস্পেনসন্ নোটিশ পাবেন। জাহাজের সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ারকে আপনার চার্জ বুঝিয়ে দেবেন।

পরের দিন সকালেই নোঙর তুলে নেয় এস্ এস্ চন্দনা। সমুদ্রের নোনা জল কেটে ধীরে ধীরে সে এসে পড়ে গম্ভীর সমুদ্রে।

নিজের কেবিনেই আবদ্ধ থাকে চন্দনার প্রাক্তন ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজল। কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের হুকুম পর্যন্ত নেই তার। কিন্তু এর মধ্যেই একদিন লুকিয়ে তার কেবিনে এসেছিল মা-পান্। ছল্ ছল্ চোখে কাজলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বিশ্বাস করুন কাজলদি, চেষ্টার ত্রুটি করি নি আমি। কিন্তু তবুও শেষরক্ষা করতে পারি নি।

ম্লান হাসি হেসে জবাব দিয়েছিল কাজল, তুমি আর কী করবে, বোন? সবই আমার বরাত!

বিধি যখন বাম হয় তখন অমঙ্গলের ষোল কলা পূর্ণ হতেও দেরি হয় না। নিজের কেবিনে আবদ্ধ থেকেও ক্যাপ্টেন কল্পনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি কাজল। একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে কাজলের ঢেকে-রাখা সিঁথির সিঁদুর চোখে পড়েছিল কল্পনার। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রায় আর্তনাদের সুরে বলে উঠেছিল কল্পনা, একী, আপনার সিঁথিতে সিঁদুর কেন? তবে কি—

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত কাজল একটু চম্‌কে উঠেই মুখ নীচু করেছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন প্রচেষ্টাই সে করে নি। সে যেন নিজেকে ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিল। যা হবার হোক্। লুকোচুরি করে আর লাভ কি?

গোটা জাহাজে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল খবরটা—জাহাজের প্রাক্তন ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজল বিয়ে করেছে।

জাহাজের প্রায় সকলেই এসে ভিড় করেছিল তার কেবিনের সামনে। কারুর মুখে বিস্ময়, কারুর দৃষ্টি শঙ্কিত। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীদের চোখে বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসা, যেন একটা কাজের মত কাজ করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে কাজল।

সাগরের জল কেটে হেলতে-দুলতে স্বদেশাভিমুখে এগিয়ে চলেছে এস্ এস্ চন্দনা। জঠরে তার এমন এক বন্দিনী বিদ্রোহিণী যে নাকি দেশের আইন-কানুনকে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কালি লেপে দিয়েছে

দেশবাসীর মুখে, যে নাকি অসহায়ভাবে নতি স্বীকার করেছে নর-নারীর সুস্থ স্বাভাবিক যুগ্ম জীবনের আহ্বানের কাছে।

॥ সাত ॥

সব থেকেও কিসের যেন একটা অভাব সেই প্রমীলা রাজ্যে। নারীমনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধের ওপর কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা সেখানকার অধিবাসীদের। উপকরণ প্রচুর, কিন্তু সৌন্দর্যচর্চায় তেমন যেন একটা মন নেই তাদের। পুরুষবর্জিত নারী রাজ্যে গুণের আদর আছে, কিন্তু রূপের প্রশংসা নেই। স্বাস্থ্যের কদর আছে কিন্তু সৌন্দর্যের স্তুতি নেই। সেখানে নারীর রূপ নিয়ে সৃষ্টি হয় না কোন কাব্য, নারীর রূপে পাগল হয়ে কোন কবি তার অমূল্য জীবন কাটিয়ে দেয় না নারী-বন্দনায়। সেখানে আকাশের চাঁদ, গাছের ফুল কিম্বা ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় ভেসে ওঠে না কারুর কল্পলোকের সুন্দরীর মনোহারিণী রূপ। সেখানে বর্ষার ধারায় বর্ষিত হয় না বিরহিণীর চোখের জল।

মাঝে মাঝে কিন্তু অলকার মনটা উদাস হয়ে ওঠে। ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, সেখানে—সেই সুদূর দিল্লীতেও ঠিক্ এই একই সূর্য আকাশের গায়ে লাল রং ছড়িয়ে উদয় হয়। রাতের চাঁদও ঠিক্ এখানকার মতই জ্যোৎস্না ছড়ায় সেখানেও। তবুও কত ব্যবধান। আচ্ছা, সেই লোকটির কি একবারও মনে পড়ে না তার কথা! লক্ষ্মীর নেশায় ডুবে গিয়ে সে কি তার মনের পাতা থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে তাকে! এমন কি তার নিজের সন্তান মিঠুকেও কি একটি বারের জন্যে দেখতে ইচ্ছে হয় না সেই মানুষটার!

এ' জীবনে আর দেখা হবে না তাদের। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাকে একা থাকতে হবে এখানে—সম্পূর্ণ একা। মিঠুও থাকবে না। কথাটা মনে হ'তেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে অলকার। ঐ ছেলেটাকে ছাড়া সে এখানে থাকবে কী নিয়ে?

এই দু'বছরে সে নিজেকে অনেকটা খাপ্ খাইয়ে নিয়েছে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে। তার নিজের সাধারণ বিদ্যেয় একটা প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারীর চাকরি পেয়েছে সে। মাইনেপত্র খুবই ভাল। সরকারী একটা ফ্ল্যাটে থাকে তারা। ভাড়া অতি সামান্য। মাস গেলে দু'দশ টাকা জমে তার হাতে। কিন্তু ঐ একটি মাত্র ব্যাপারে সে কর্তৃপক্ষের হুকুম মত চলতে পারে নি। অবসর সময়ে তার মনে পড়ে স্বামীর কথা। শত অন্যায় অবিচার করলেও সে তার স্বামী—তার ইহকাল পরকালের আরাধ্য দেবতা। এ'কথা শুধু মুখে নয়, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে। কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে রাখতে হয়। কেউ টের পেলে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা।

মনে মনে মোটামুটি একটা হিসেব থাকলেও সেই ভয়ঙ্কর দিনটি যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে তা' ঠিক্ অনুমান করতে পারে নি অলকা। তাই, মহিলা পুলিশ কর্মচারীটির হাত থেকে নোটিশখানা নিয়ে সে বললে, কীসের কাগজ এটা ?

ভাবলেশহীন মুখে জবাব দেয় পুলিশ কর্মচারীটি, পড়ে দেখুন। ওতেই লেখা আছে।

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে কাগজটা পড়তে থাকে অলকা।

পড়তে পড়তে কিন্তু রক্তশূন্য হয়ে ওঠে তার মুখখানা। থর থর করে কাঁপতে থাকে হাতের আঙ্গুলগুলো। চোখ ফেটে জল আসে তার। কান্নাচাপা গলায় সে প্রশ্ন করে, আর মাত্র সাতদিন পরেই মিঠুকে নিয়ে যাবেন আপনারা?

—হ্যাঁ। সাতদিন পরেই ওর বয়স ছ'বছর পূর্ণ হবে।

পাশের ঘরে বসে খেলা করছিল মিঠু একটা ছোট সাইকেল নিয়ে। অপরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর শুনে সাইকেল চেপেই সে এসে উপস্থিত হয়। পোশাক-পরা পুলিশ কর্মচারীটির দিকে ভয়ে ভয়ে একবার তাকায়। তারপর অলকার কান্নাচাপা মুখের দিকে তাকিয়ে তার শিশুমন অনুমান করে নিশ্চয়ই ঐ মেয়ে পুলিশটা তার মাকে খুব বকেছে। তাই

ভীত অথচ চড়া সুরে সে পুলিশ কর্মচারীটিকে বললে, তুমি আমার মাকে বক্‌লে কেন? জানো, আমার একটা বন্দুক আছে!

মৃদু হেসে পুলিশ কর্মচারীটি বললে, তোমার মাকে তো আমি বকিনি, খোকা।

—আমার নাম খোকা নয়। আমার নাম মিঠু। ভাল নাম দীপঙ্কর। গম্ভীর কণ্ঠে বললে মিঠু।

—ও, তাই নাকি? তা' দীপঙ্করবাবু, তোমাকে তো এখান থেকে চলে যেতে হবে।

ভাল নামের সম্বোধনে মনটা খুশী হয় মিঠুর। হেসে জবাব দেয়, কোথায়?

—অনেক দূরে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে মিঠু। বললে, তাই নাকি, কবে? বেশ মজা হবে তা'হলে। গাড়ি চড়ে আমি আর মা চলে যাব অনেক দূরে—

—তোমার মা যাবেন না। একা তোমাকে যেতে হবে।

এক মুহূর্ত পুলিশ কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে মিঠু বুঝতে চেষ্টা করে সে ঠাট্টা করছে কি না। তারপর গম্ভীর মুখে সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যেতে যেতে বললে, একা আমি যাবই না।

দেশের আইন-কানুন কড়া। এই আইন না মেনে কারুর উপায় নেই। এখানে এসে বসবাস করবার সময় তাকে অঙ্গীকার করতে হয়েছিল, ঠিক্ ছ'বছর পূর্ণ হলেই মিঠুকে ছেড়ে দিতে হবে। সেই সময় এখন উপস্থিত। আর মাত্র সাতটি দিন বাকি। তারপরই কর্তৃপক্ষ নিয়ে যাবে মিঠুকে। যেতে না চাইলে জোর করে নিয়ে যাবে তারা।

স্কুলে না গিয়ে বাড়িতেই বসে থাকে অলকা। দিনরাত কেবল ঐ একমাত্র চিন্তা। খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেছে। চোখে ঘুম নেই। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুমে অচেতন মিঠুকে কোলের কাছে টেনে এনে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে। শেষ রাতে একটু তন্দ্রার মত এলে অকস্মাৎ চম্‌কে ওঠে। মিঠুকে বুকের ওপর চেপে ধরে ডুক্‌রে কেঁদে

ওঠে, না-না, তা' হবে না। তা' হতে পারে না। মিঠুকে ছেড়ে দিয়ে আমি কিছুতেই বাঁচব না।

অবশেষে মনস্থির করে ফেলে অলকা। শেষ উপায়টিই বেছে নেয় সে—দেশের গভর্ণরের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে হবে। আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে।

গভর্ণর হাউসের একটি মাঝারি মত কক্ষের একপাশে একটা সোফায় বসেছিল অলকা। সঙ্গে মিঠু। বেলা ন'টায় তার ইন্‌টারভিউ হবে স্বয়ং গভর্ণরের কাছে। মনে মনে নিজের বক্তব্য ঠিক্ করে নিচ্ছিল অলকা। আশায় আশঙ্কায় বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল তার। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে নিজের চোখেব জল মুছে নিচ্ছিল।

এমনি সময় গভর্ণর সমাপ্তিকার খোদ্ প্রাইভেট সেক্রেটারী এসে হাজির হয় সেখানে। বয়স হয়েছে মহিলার। মাথার চুলে পাক ধরেছে। মুখখানা কিন্তু বেশ প্রশান্ত। করুণামাখা চোখের দৃষ্টি।

মহিলাটি অলকার সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে মিঠুর গাল টিপে একটু আদর করে। তারপর অলকার দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন এবার।

সুসজ্জিত বড় হলঘর। কার্পেটমোড়া মেঝে। জয়পুরী কাজকরা দেয়ালচিত্র চারিদিকে। জানালায় পুরু মখ্‌মলের পর্দা।

শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত সেই হলঘরের ঠিক্ মাঝখানে একটা উঁচুমত প্ল্যাটফর্মের ওপর বিরাট একটি সেক্রেটারীয়েট টেবিল। বর্মা টিকের তৈরী টেবিলটা হলঘরের আলোয় চক্‌চক্ করছে। সাবেকী দিনের সিংহাসনের মত কারুকার্য-করা একখানা চেয়ারে বসে আছে গভর্ণর সমাপ্তিকা—গোটা দ্বীপের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী। পরনে একখানা হাল্কা আকাশী রঙের শাড়ি। গায়েও অনুরূপ রংয়ের একটা ব্লাউজ। গলায় একগাছা সরু হারের সঙ্গে একখানা বড় হীরের লকেট্। কানে দুটি মুক্তার দুল। মুখে হাল্কা প্রসাধনের চিহ্ন।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একখানা কাগজ পড়ছিল সমাপ্তিকা। সুন্দর মুখে একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য।

ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ায় অলকা। মা'র পাশে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চোখে এদিক-ওদিক দেখছিল মিঠু।

প্রৌঢ়া প্রাইভেট সেক্রেটারী সমাপ্তিকার পাশে এসে নীচুকণ্ঠে কিছু বলতেই সামাপ্তিকা মুখ তুলে তাকায় অলকার দিকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, দেশের আইনমত চলতে হবে আপনাকে। আপনার ছেলেকে এদেশে রাখা চলবে না।

বিষণ্ণ চোখ দু'টোয় জলের ধারা নামে অলকার। হাতজোড় করে ধরা গলায় সে বললে, আপনি যদি দয়া করেন—

—দয়ার প্রশ্ন ওঠে না এখানে। আর, তেমন কোন বিশেষ কারণ আছে বলেও মনে করি না আমি।

কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে থাকে অলকা, এইটুকু ছেলে। আমি কাছে না থাকলে ও বাঁচবে না কিছুতেই।

একটা মৃদু হাসির রেখা সমাপ্তিকার ঠোঁটের ওপর দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। সে আবার বললে, এর আগেও অনেক ছেলেকে আমরা এখান থেকে পাঠিয়ে দিয়েছি। যতদূর জানি, তারা বেশ ভালভাবেই বেঁচে-বর্তে আছে।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে জবাব দেয় অলকা, আপনি একটু দয়া করুন। আর অন্তত দুটো বছর ওকে থাকতে দিন আমার কাছে। তারপর একটু বুঝতে শিখলে আমাকে ছেড়ে থাকতে আর কোন কষ্ট হবে না ওর।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে সমাপ্তিকা বললে, আপনি কী করে বুঝলেন যে আপনাকে ছাড়া ও আর বাঁচবে না? ও কি কখনও আপনার কাছ ছাড়া হয়েছে?

—না, হয় নি। আর হয়নি বলেই বলছি আমাকে ছাড়া ও হয়ত বাঁচবে না।

একটু সময় কি যেন চিন্তা করে সমাপ্তিকা। মাথা নীচু করে হাতের মোটা পেন্সিল্‌টা বার দুই ঠোকে টেবিলের ওপর।

আশান্বিতা হয় অলকা। হয়ত দয়া হয়েছে ওর।

একসময় মুখ তুলে তাকায় সমাপ্তিকা। একবার দেখে নেয় মিঠুকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললে, দু'বছর নয়। তবে ছ'মাসের সময় দিলুম। অবশ্যি এই ছ'মাস আপনার ছেলে আপনার কাছে থাকবে না। এখানকার সরকারী অতিথিশালায় থাকবে। তাতে যদি দেখা যায় আপনাকে ছেড়ে থাকতে ওর কোন অসুবিধেই হচ্ছে না, তা'হলে ওকে তখন পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গভর্ণরের প্রৌঢ়া প্রাইভেট সেক্রেটারী মহিলাটি এতক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মিঠুর দিকে। এবার, সমাপ্তিকা থামতেই সে তার দিকে তাকিয়ে নম্রকণ্ঠে বললে, অতিথিশালায় থাকবার প্রয়োজন কী? আপনি যদি অনুমতি করেন তো এই ছেলেটিকে আমি আমার নিজের কাছেই রাখতে পারি এই ছ'টা মাস।

—বেশ আপনার যখন তাই ইচ্ছে, তবে তাই হোক্‌।

গভর্ণর হাউসের একপাশেই তাঁর প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারীর কোয়ার্টার। সেখানেই আশ্রয় পায় মিঠু ছ'মাসের জন্যে।

একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে স্বাগতা। ছবির অভিমন্যুর প্রতি প্রেমে সে প্রায় দিশেহারা। এখন আর রেখে-ঢেকে কিছু না করে প্রায় প্রকাশ্যেই সেই ম্যাসকিউলিনা ম্যাগাজিনটা বের করে সে তাকিয়ে থাকে অভিমন্যুর ছবির দিকে।

ব্যাপারটা একদিন সুলোচনার নজরেও পড়েছিল। চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি হেনে শঙ্কিত কণ্ঠে সে বলেছিল, একী সর্বনাশা কাণ্ড আরম্ভ করেছিস তুই? কোত্থায় পেলি এই ম্যাগাজিন? তোকে যে জেলে যেতে হবে, হতভাগী।

তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিয়েছিল স্বাগতা, যেতে হয় যাব।

—যেতে হয় যাব ! মেয়ের কথাটা পুনরাবৃত্তি করেছিল সুলোচনা। তারপর আবার বলেছিল, যা হবার নয় তা' নিয়ে এমন মাতামাতি করে কী লাভ বলতে পারিস ? শুধু শুধু বিপদ ডেকে আনার প্রয়োজন কী ?

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছিল স্বাগতা, বিপদ হবে কেন ? একথা আর কে জানতে আসছে ?

একদিন কিন্তু সত্যিই আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি টের পেয়েছিল ব্যাপারটা। সে হচ্ছে ওদের ঠিকে ঝি।

সেদিন বিকেলে নিজের বিছানায় শুয়ে ম্যাসকিউলিনা ম্যাগাজিনের অভিমন্যুর ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল স্বাগতা। কেমন যেন একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। দিনান্তে অন্তত ছবিটা না দেখলে ভাল লাগে না তার। মাঝে মাঝে মনে হয় এই অভিমন্যুর সঙ্গে যেন তার যুগযুগান্তরের সম্বন্ধ। ওর চোখের ঐ রহস্যময় দৃষ্টি যেন তার পরিচিত। ওর মুখের ঐ মিষ্টি হাসিটুকু পর্যন্ত অচেনা নয় তার। ঐ চোখ, ঐ নাক, ঐ হাসি, সব—সবকিছু তার বহুকালের চেনা।

এক এক সময় তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় ছবিটা। রক্তমাংসে গড়া অভিমন্যু এসে দাঁড়ায় তার চোখের সামনে। ব্রীড়া সঙ্কুচিত চিত্তে স্বাগতা কেবল তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে ভরে ওঠে মনটা। কুণ্ঠা-বেদনা জড়িত কণ্ঠে হয়ত কিছু বলতে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায় অভিমন্যু। ছবিটাকে বুকের ওপর চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে স্বাগতা।

সেদিনও বিহ্বল দৃষ্টিতে ছবিটা দেখছিল স্বাগতা। এমন সময় পাশের ঘরে সুলোচনা ডাকে মেয়েকে।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে ম্যাগাজিনটা বিছানার ওপর রেখেই পাশের ঘরে যায় স্বাগতা।

ঠিক্ এমনি সময় ঠিকে ঝি ঝাঁট দিতে স্বাগতার ঘরে ঢুকেই

তার দৃষ্টি পড়ে ম্যাগাজিনটার উপর। স্বাভাবিক কৌতূহল বশে সেটা হাতে নিয়েই একেবারে থ' হয়ে যায় সে। একী সাংঘাতিক কাণ্ড! তার স্বাগতা দিদিমণি কি লুকিয়ে লুকিয়ে এই পুরুষ মানুষের ছবিটা দেখছিল নাকি!

খবরটা কিন্তু আর চাপা থাকে নি। এক'কান দু'কান করে অনেক কানেই ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে একদিন সকালে নগরীর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডোরোথি একদল মেয়ে পুলিশ নিয়ে এসে গাড়ি থেকে নামে সুলোচনার বাড়ির সামনে।

শঙ্কিত হয়ে ওঠে সুলোচনা। নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাগতা। ডোরোথির প্রশ্নের জবাবে সে হ্যাঁ—না কিছুই বলে না।

সমস্ত বাড়িটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসী করে ডোরোথি। অবশেষে স্বাগতার বিছানার নীচে পাওয়া যায় সেই ম্যাসকিউলিনা ম্যাগাজিন।

কঠিন কণ্ঠে সেই মধ্যবয়সী মহিলা এস. পি. প্রশ্ন করে স্বাগতাকে, এই ম্যাগাজিনটা কোথায় পেয়েছেন?

চুপ করে থাকে স্বাগতা।

একটার পর একটা পাতা উল্টে দেখতে থাকে ডোরোথি। একসময় অভিমন্যুর ছবিটার ওপর নজর পড়তেই তার চোখে পড়ে নিচে কালি দিয়ে লেখা রয়েছে দু'টো লাইন—তোমাকে কোনদিন চোখে দেখি নি আমি, কোনদিন দেখবও না। তবুও তোমাকেই আমি ভালবাসি।

কর্কশ কণ্ঠে ডোরোথি প্রশ্ন করে, এই লেখা কার?

অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দেয় স্বাগতা, আমার।

—আচ্ছা! স্বাগতার মুখের পানে একটা তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহিলা এস পি. ডোরোথি।

অবশেষে স্বাগতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ বাহিনী। কান্নায় ভেঙে পড়ে সুলোচনা।

মামলা ওঠে আদালতে। চেষ্টার ত্রুটি করে নি সুলোচনা। মেয়ের

জন্যে একজন প্রথম শ্রেণীর মহিলা এ্যাড্‌ভোকেট নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এ্যাড্‌ভোকেটের নির্দেশ অমান্য করে সর্বসমক্ষে নিজের দোষ স্বীকার করেছিল স্বাগতা। বলেছিল, হ্যাঁ আমি ভালবাসি ঐ অভিমন্যুকে। আর, একথা স্বীকার করতে একটুও লজ্জিত নই আমি। আদালত কক্ষে সেদিন মহিলাদের ভিড়। তারা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছিল সেই বিদ্রোহিণীর মুখের নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি।

মহিলা বিচারক স্বাগতাকে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

কিন্তু তবুও নিবৃত্ত হয় নি সুলোচনা। উচ্চ আদালতে আপীল করেছিল। সেখানেও স্বাগতার দণ্ডাদেশ বহাল রইল। অবশেষে খোদ গভর্ণরের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছিল সুলোচনা মেয়ের তরফে।

গভর্ণর হাউসের হলঘরের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়েছিল স্বাগতা। সঙ্গে পুলিশ পাহারা।

ম্যাসকিউলিনা ম্যাগাজিনটাও পেশ করা হয়েছিল গভর্ণর সমাপ্তিকার সামনে। অভিমন্যুর ছবিটার ওপর চোখ পড়তেই স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বসেছিল সমাপ্তিকা। পারিপার্শ্বিকতাও যেন ভুলে গিয়েছিল সে। মুহূর্তে তার সারা দেহটা কেঁপে উঠেছিল একবার। ছবির নীচে স্বাগতার লেখা লাইন ছুটোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করেছিল স্বাগতাকে, নিচের এই লেখা আপনার ?

সামান্য একটু মাথা আন্দোলিত করে সায় দিয়েছিল স্বাগতা।

অকস্মাৎ মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সমাপ্তিকার। ভয়ঙ্কর এক অগ্নিশিখা যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল তার সমস্ত দেহমনে। নিদারুণ ক্রোধে তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। তিক্ত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করেছিল, একে ভালবাসেন আপনি ?

এবারও মাথা আন্দোলিত করে সায় দেয় স্বাগতা। একটা বিদ্রোহিণী ভাব তার চোখে-মুখে।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় তখন কাঁপছিল সমাপ্তিকা। তার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী পর্যন্ত গভর্ণরের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে শঙ্কিত দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়েছিল তার দিকে। গভর্ণর সমাপ্তিকার এমন ভয়ানক রূপ সে কখনও দেখেনি এর আগে।

অকস্মাৎ প্রায় চিৎকার করে ওঠে গভর্ণর সমাপ্তিকা। আত্মশাসনে বিফল হয়ে সে বলে ওঠে, নিয়ে যাও—নিয়ে যাও জঘন্য অপরাধে অপরাধিনী এই নারীকে আমার চোখের সামনে থেকে। আদালত ঠিকমত বিচার করতে পারে নি। ওর দণ্ডাজ্ঞা বাড়িয়ে দিলাম। ছ'মাসের বদলে ওকে একবছর জেলে থাকতে হবে—এই আমার আদেশ। বলেই ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সমাপ্তিকা। তারপর হন হন করে চলে যায় নিজের চেম্বারের দিকে।

ভয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই প্রাইভেট সেক্রেটারী মহিলা। গভর্ণরের এমন প্রচণ্ড ক্রোধের কারণ সে বুঝতে পারে না। এধরনের অপরাধ এদেশে এই নতুন নয়। এর আগেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। ক্ষেত্রবিশেষে অনেকের দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস করেও দিয়েছে গভর্ণর তার বিশেষ ক্ষমতা বলে। কিন্তু এই মেয়েটির ক্ষেত্রে উনি এমন নির্দয় হয়ে উঠলেন কেন?

হিতে বিপরীত হল। মার্জনার বদলে বেড়ে গেল কারাদণ্ডের মেয়াদ। শোকে-দুঃখে শয্যা নেয় সুলোচনা।

॥ আট ॥

রাতের পর দিন আসে, দিনের পর রাত। পুরুষহীন সেই প্রমীলা রাজ্যেও ব্যতিক্রম হয় না এই নিয়মের। কালের চাকা ঘুরতে থাকে আপন নিয়মে।

গভর্ণরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কোয়ার্টারে বেশ ভালই আছে মিঠু। দাসী চাকরাণীর অভাব নেই সেখানে। তাদের কাছে থাকে সে। অবসর সময়ে মহিলা প্রাইভেট সেক্রেটারী নিজে দেখাশোনা

করে তার। কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে ছেলেটার ওপর। সরলচিত্ত শিশু। ওদের আবার স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ কী? মাসে একবার ছেলেকে দেখতে আসে অলকা। নিজের হাতে তৈরি খাবার নিয়ে এসে খাওয়ায় তাকে। মার সঙ্গে বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরে মিঠু। অতিকষ্টে তাকে ভুলিয়ে রেখে চোখের জল চেপে বাড়ি ফিরে যায় অলকা।

দিনের অধিকাংশ সময় মিঠুর কাটে গভর্ণর হাউসের বাগানে। চারিদিকে ছোট ছোট সারি সারি গাছ। মধ্যে রং-বেরংয়ের ফুলের কেয়ারি। সরু বাঁধান রাস্তা। ঐ রাস্তায় ছোট্ট মিঠু আপন মনে তার তিনচাকার সাইকেল চালায়।

মাঝে মাঝে স্বয়ং গভর্ণর সমাপ্তিকার সঙ্গেও দেখা হয় মিঠুর। বাগানে বেড়াতে এসে হয়ত একটা বেঞ্চির ওপর বসে সমাপ্তিকা। সাইকেল থেকে নেমে হয়ত একটা প্রজাপতির পিছু পিছু ছোটে মিঠু। হঠাৎ সমাপ্তিকাকে দেখে থমকে দাঁড়ায় সে। মিঠুকে কাছে ডাকে সমাপ্তিকা। গুটি গুটি এগিয়ে আসে মিঠু। অল্পসময়ের মধ্যেই তার সঙ্গে ভাব করে ফেলে সমাপ্তিকা। মিঠু মনের আনন্দে আবোল-তাবোল কথা বলতে থাকে তার সঙ্গে। হয়ত এমন সব উদ্ভট শিশুসুলভ প্রশ্ন করে যার জবাব স্বয়ং সমাপ্তিকারও জানা থাকে না।

পরের দিন আবার দেখা হয় দু'জনের। সমাপ্তিকা চকোলেট দেয় মিঠুকে। মনের আনন্দে চকোলেট চিবোতে থাকে মিঠু। সমাপ্তিকা প্রশ্ন করে, কেমন লাগছে? জবাব দেয় মিঠু, খুব ভালো—তুমিও খুব ভালো। হাসে সমাপ্তিকা।

এমনিভাবে দীর্ঘ ছ'মাসে এই দুটি অসম জীবনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক বিচিত্র সখ্যতা। কোন কারণে মিঠু একদিন বাগানে না এলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সমাপ্তিকা। খবর নেয় তার।

কোনরকম দরবার ছাড়াই মিঠুর থাকার মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দেয় স্বয়ং গভর্ণর নিজে। আশার আলো দেখতে পায়

অলকা। মনে মনে ভাবে, হয়ত গভর্ণর নিজেই ওর জন্যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করবেন। প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর ওপর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মন।

দেখতে দেখতে সেই ছ'মাসও কেটে যায়। শঙ্কিত হয়ে ওঠে সমাপ্তিকা। তার নিজের পক্ষে এমন একটা দুর্বলতা তো ভাল নয়। লোকে কী বলবে?

খবর যায় অলকার কাছে। কেঁদে ওঠে সে। আশার আলো নিবে যায় তার চোখের সামনে। দরবার করে স্বয়ং প্রাইভেট সেক্রেটারী। কিন্তু কোন ফল হয় না। সমাপ্তিকা অনড়। এতটুকু বিচলিত না হয়ে মিঠুকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার হুকুমনামায় সই করে সমাপ্তিকা।

যেদিন মিঠুকে নিয়ে পুলিশের গাড়িটা তার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর বাড়ির সামনে থেকে চলে যায় সেদিন সম্ভবত সমাপ্তিকার মনটাও খুব খারাপ হয়েছিল। নইলে, সেদিন সে গভর্ণর হাউসের দোতলায় দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে ছল্ ছল্ চোখে সেদিকে তাকিয়েছিল কেন? কেনই বা সেদিন তার খাস্ পরিচারিকা তার খাবার নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছিল? কেনই বা সেদিন—শুধু সেদিন কেন, তারপরও আট-দশদিন সমাপ্তিকা বাগানে বেড়াতে আসে নি?

মিঠুর চলে যাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়লেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে সমাপ্তিকার। সজল হয়ে ওঠে চোখ দু'টো। শুধু বিদেশী কবির সেই বিশ্ববিখ্যাত পংক্তিটা মনে পড়ে তার—

দণ্ডিতের সাথে, দণ্ডদাতা
কাঁদে যবে সমান আঘাতে,
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

হ্যাঁ, ন্যায় বিচারই করেছে সমাপ্তিকা। মনের আবেগ পারে নি তার বিচারকে কলুষিত করতে। মিঠু সম্বন্ধে এইটুকুই কেবল সান্ত্বনা সমাপ্তিকার।

অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে সে ভবিষ্যতে আর অপরাধ করবে না তাহলে বলতে হয় স্বাগতাকে শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। জেল থেকে একবছর পর বেরিয়ে এসেও তার মনের কাঠামোর পরিবর্তন হয় নি এতটুকু। ম্যাসকিউলিনা ম্যাগাজিন্‌টা আর তার কাছে নেই। অভিমন্যুর ছবিটা দেখবার সুযোগও নেই তার। কিন্তু তার মনের চিত্রশালায় সংগৃহীত ছবিগুলোর মধ্যে যে অভিমন্যুর ছবিটিই প্রধান তাতে কোন সন্দেহই নেই। কর্তৃপক্ষের সাধ্য নেই, তার মন থেকে মুছে ফেলে সেই ছবির রেখাগুলি। বিদেশী কবির সেই লাইন্‌টা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তার জীবনে—

নয়ন সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

একবছর পর্যন্ত কোন খবর নেই কাজলের। এই সময়ের মধ্যে যেখানে সে সাত-আটবার জাহাজ নিয়ে আসত সেখানে একবারও এল না। জাহাজ এস্ এস্ চন্দনা কিন্তু ঠিকমতই যাতায়াত করে। মাঝি-মাল্লারাও প্রায় সবাই ঠিক আছে। নেই কেবল ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজল।

সোমনাথের বুঝতে বাকি থাকে না, কাজলের নিশ্চই কোন বিপদ হয়েছে। কিন্তু কী সেই বিপদ তা সে জানতে পারে নি এখনও। কাকে জিজ্ঞেস করবে ? কে দেবে তার প্রশ্নের জবাব ?

বন্দরে নোঙর করা চন্দনা জাহাজের আশেপাশে মাঝে মাঝেই ঘোরাফেরা করে সোমনাথ। উদ্দেশ্য, যদি কোনরকমে কাজলের কোন খবর জোগাড় করা যায়। কিন্তু সবই বৃথা। চন্দনা জাহাজ ছেড়ে কোন নাবিক কিম্বা কোন অফিসার শ্রেণীর মহিলা সাধারণত বাইরে আসে না। অবশ্যি একজন প্রৌঢ়া অফিসার সহরে যাতায়াত করে মাঝেমধ্যে। সোমনাথ অনুমান করে ইনিই সম্ভবত এস্ এস্ চন্দনার নতুন ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার। দু'একবার ঐ মহিলাটির সঙ্গে

আলাপ করতে চেষ্টাও করেছিল সে। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে তেমন একটা ভরসা পায় নি সোমনাথ। তাই আসল কথাটা আর জিজ্ঞেস করতে পারে নি। কি জানি, তাতে যদি হিতে বিপরীত কিছু হয় কাজলের ?

আরও একজন মহিলা মাঝে মাঝে জাহাজের বাইবে আসে। সে হচ্ছে খালাসীদের সর্দারণী নিগ্রো এমিলা জোসেফ্। জাহাজের কর্মীদের খাবার সংগ্রহ কবতেই সে বাজার এলাকায় ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওর নিকষ কালো মহিষমর্দিনী চেহারা আব পুরুষালী হাবভাব দেখে ওর কাছে ঘেঁসতেই সোমনাথ তেমন সাহস পায় না।

কিন্তু তবুও হাল ছাড়ে না সোমনাথ। অবসর সময় সে নিয়মিত আসে বন্দবে। বন্দরের সরকারী বাগিচায় একটা বেঞ্চির ওপর বসে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে এস্ এস্ চন্দনাব দিকে। এক একদিন মরিয়া হয়ে ওঠে সে। ইচ্ছে হয় সোজা চলে যায় ঐ জাহাজটার ভেতব। কিন্তু নিজেকে সংযত করতে হয়। এ ধরনের কোন হঠকারিতায় নিজেরই বিপদের সম্ভাবনা। কাজেই সোমনাথ আশায় বুক বেঁধে বসেই থাকে সরকারী বাগানে।

এমনিভাবেই একদিন নোঙর তুলে চলে যায় এস্ এস্ চন্দনা। নিরাশ হয়ে ওঠে সোমনাথ। মাঝে মাঝেই খবব নেয়, কবে আবাব চন্দনা আসবে। আবার ফিরে আসে এস্ এস্ চন্দনা। আবার ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষায় থাকে সোমনাথ।

সেদিন হাসপাতালের কাজ শেষ করে বন্দরের সেই বাগিচায় হাজিরা দিতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল সোমনাথের। সন্ধ্যে হয় নি তখনও। একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে সেই প্রমীলা দ্বীপের জাহাজ এস্ এস্ চন্দনা শ্বেত রাজহংসীর মত জলে ভাসছে।

হঠাৎ চন্দনার পেছন দিকে নজর পড়ে সোমনাথের। বন্দরের গুটিকয়েক পুরুষকর্মী চন্দনার দেহে নতুন করে রং লাগাতে ব্যস্ত।

আর পাড়ে দাঁড়িয়ে অল্পবয়সী একজন অফিসার শ্রেণীর মহিলা তাদের কাজ তদারক করছে।

চোখ ছু'টো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সোমনাথের। বার্মীজ ধরনের চেহারা মেয়েটির। তবে কি ঐ মেয়েটিই মা-পান্? কাজলের মুখে এই মা-পানের কথা অনেকবার শুনেছে সোমনাথ। মেয়েটি যে কাজলের খুব অনুগত ছিল এককালে তা'ও তার অজানা নয়। এই দীর্ঘদিনের অপেক্ষায় কিন্তু একবারও সে দেখতে পায় নি তাকে। কিন্তু মেয়েটি যদি অন্য কেউ হয়? যা' হবার হবে। সোমনাথ কিছুতেই এই সুযোগ ছেড়ে দেবে না।

মনটা আনন্দে নেচে ওঠে সোমনাথের। বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েই বাধা পায়।

—দয়া করে আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন? পাজামা পাঞ্জাবী পরা একটি সুপুরুষ যুবক এসে সামনে দাঁড়ায় তার। সমুদ্রের হাওয়ায় তার রুক্ষ চুলগুলি উড়ছিল।

একটু যেন বিরক্ত হয় সোমনাথ। যুবকটির মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই সে আবার মুখ ঘুরিয়ে তাকায় এস্ এস্ চন্দনার দিকে। তারপর অন্যমনস্কভাবে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট প্যাকেট্ টেনে তুলে যুবকটির হাতে দিয়েই এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

দেশলাইয়ের বদলে সিগারেট প্যাকেট্টা পেয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যুবকটি।

পায়ে পায়ে এস্ এস্ চন্দনার পেছন দিকে এগিয়ে যায় সোমনাথ। মেয়েটি কিন্তু একাগ্র দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রংয়ের কাজ দেখছিল। অকস্মাৎ একেবারে কাছে পুরুষ কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সে।

—কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম কি মা-পান্? আপনি কি এই চন্দনার এ্যাপ্রেন্টিস্?

ভয়ে মুখখানা প্রায় নীল হয়ে ওঠে মেয়েটির। জাহাজের কেউ

যদি দেখে ফেলে যে সে একজন পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে তা'হলে একেবারে সর্বনাশ! বিশেষ করে ক্যাপ্টেন কল্পনার চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই!

চকিতে একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শ.ঙ্কিত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, হ্যাঁ, তবে এখন আর এ্যাপ্রেন্টিস্ নই—পুরোপুরি কর্মী। কিন্তু কেন বলুন তো?

—আমার নাম সোমনাথ। আমি আপনাদের কাজলদির—

মুখে আঙ্গুল দিয়ে সোমনাথকে চুপ্ করতে বলে মা-পান্। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললে, হ্যাঁ জানি, কাজলদির কাছেই আপনার কথা শুনেছি।

—কাজল এখন কোথায়? সে ভাল আছে তো?

আর একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায় মা-পান্। তারপর সোমনাথের আরও একটু কাছে সরে এসে ফিস্ ফিস্ করে গোটা কয়েক কথা বলেই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কর্মীদের কাজ দেখতে থাকে।

কৌতূহলী সোমনাথ আরও কিছু প্রশ্ন করতে চায় মা-পান্‌কে। কিন্তু মা-পান্ নির্বিকার। সে যেন সেই মুহূর্তে চেনেই না সোমনাথকে, এমনি তার ভাব-ভঙ্গি।

প্রায় মিনিট দশেক পরে ধীর ক্লান্ত পদক্ষেপে সোমনাথ যখন সেই বাগানে ফিরে এসে বেঞ্চিটায় দেহভার এলিয়ে দেয় তখন তার মুখখানা চিন্তাভারাক্রান্ত। এতদিন অপেক্ষা করার পর কাজলের খবর পাওয়া গেছে আজ। কিন্তু খুবই খারাপ সেই খবর। এখন তবে কী উপায়? তার নিজের অদৃষ্টের ওপর তাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া স্বামী হিসেবে কি আর কিছু কর্তব্য তার নেই?

বোধহয় কাছেই কোথাও ছিল সেই যুবকটি। সোমনাথকে ফিরে আসতে দেখে সেও এগিয়ে আসে তাব কাছে। তারপর সোমনাথের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি বলে মাপ্ করবেন। আপনার

এই সিগারেটের প্যাকেট্টা রাখুন। আমি কেবল দেশলাইটা চেয়েছিলাম।

লজ্জিত মুখে একবার যুবকটির দিকে তাকায় সোমনাথ। তারপর সিগারেট প্যাকেট্টা পকেটে রেখে দেশলাই বাক্সটা যুবকটির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, কিছু মনে করবেন না! আমি তখন একটু অন্যমনস্ক ছিলুম।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে হেসে যুবকটি বললে, না—না, এতে মনে করার কী আছে? আমিও লক্ষ্য করেছিলুম আপনি ঐ এস এস্ চন্দনার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছিলেন।

—হ্যাঁ, দীর্ঘ একবছর অপেক্ষা করার পর একটা খবর জানতে ছুটে গিয়েছিলুম ওখানে।

অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু সাবধান হয়ে ওঠে সোমনাথ। অপরিচিত এই ব্যক্তির কাছে কথাটা বলে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হল না।

সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে সোমনাথের পাশেই বসে পড়ে যুবকটি। তারপর অনেকটা হাল্কাসুরে বললে, সাংঘাতিক ধৈর্য তো আপনার! একটা খবর জোগাড় করতে একবছর অপেক্ষা করতে হয়েছে আপনাকে?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে সোমনাথ বললে, আপনি বুঝি এদিকেই থাকেন?

—হ্যাঁ, আপনি?

—আমিও এই সহরেই থাকি। এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার আমি।

—ও, তাই নাকি? দাঁড়ান—দাঁড়ান। একমুহূর্ত তার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে যুবকটি কিছু মনে করতে চেষ্টা করে বললে, ঠিক্, এবার মনে পড়েছে। এখানকার হাসপাতালেই আপনাকে দেখেছি। আপনিই বোধহয় ডক্টর সোমনাথ—

মৃদু হেসে সায় দেয় সোমনাথ।

নিজে থেকেই যুবকটি নিজের পরিচয় দেয়, আমার নাম অভিমন্যু। এই সহরেই থাকি। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেও কাজকর্ম কিছুই করি না। বাবার হোটেলে থাকি, ছবি আঁকি আর বেহালা বাজাই। বলেই হো-হো শব্দে হেসে ওঠে অভিমন্যু।

হেসে জবাব দেয় সোমনাথ, সেদিন একটা কোন্ কাগজে যেন আপনার ছবি দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে।

সে কথার জবাব না দিয়ে অভিমন্যু আবার প্রশ্ন করে, তা' হাস-পাতালের পরিশ্রমের পর এই পরিবেশে এসে বিশ্রাম করেন নাকি আপনি? না, কেবল সেই খবরটি জোগাড় করতেই এখানে ছুটে আসেন?

প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে সোমনাথ জবাব দেয়, দু'টো কাজেই বলতে পারেন।

আমিও অবশ্যি মাঝে মাঝে এখানে আসি জাহাজীদের কাছ থেকে কিছু খবর জোগাড় করতে। বললে অভিমন্যু।

—কীসের খবর?

—এই, সমুদ্রের হালচাল আর কি।

—কেন, সাগর-পাড়ি দেবার ইচ্ছে আছে নাকি?

—হ্যাঁ, আছে। একমুহূর্ত চিন্তা করে অভিমন্যু আবার বললে, তবে জাহাজে চড়ে নয়, মোটর লঞ্চে করে।

—সেকি? মোটর লঞ্চে সমুদ্র পাড়ি দেবেন? কোথায় যেতে চান্?

—দূর অবশ্যি বেশি নয়। শ'খানেক মাইলের মত। তবে যেতে পারব কিনা তাই প্রশ্ন।

কৌতূহল বেড়ে ওঠে সোমনাথের। প্রশ্ন করে আবার, এখান থেকে একশ' মাইলের মত পূবে তো' একটা প্রমীলা-রাজ্য আছে বলে শুনেছি। আর একশ' মাইল দক্ষিণে—

সোমনাথকে তার কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠে অভিমন্যু, না—না, দক্ষিণে নয়। ঐ পূবদিকেই যাব।

—সেকি মশাই! পাগল নাকি আপনি? প্রমীলা-রাজ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলে কি আর জ্যান্ত ফিরে আসতে পারবেন বলে আশা করেন?

একটা বিচিত্র হাসি জেগে ওঠে অভিমন্যুর ওষ্ঠপ্রান্তে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সে বলতে থাকে, ওকে কেবলমাত্র একবার চোখের দেখা দেখতে চাই আমি। তারপর যদি আমার মৃত্যুও হয়, তাতেও দুঃখ নেই আমার।

কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়ে তুলে আবার প্রশ্ন করে সোমনাথ, সেখানে কে আছে আপনার? কাকে দেখতে গিয়ে জীবন দিতেও আপনি প্রস্তুত?

খানিকক্ষণ চুপ্ করে থাকে অভিমন্যু। আস্তে আস্তে তার চোখের স্বপ্নময় দৃষ্টি সহজ হয়ে ওঠে। একটু হেসে সে জবাব দেয়, এই দেখুন, বোকার মত সব গোপন কথা বলে ফেললাম আপনাকে। দয়া করে আপনি আবার এসব কথা—

নিজের মনে দ্রুত চিন্তা করে চলছিল সোমনাথ। এই যোগাযোগ কি ভগবানের কোন ইঙ্গিত? নইলে, এতদিনের মধ্যে কেবল আজই অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা হল কেন তার?

অভিমন্যুর কথা শেষ হবার আগেই সোমনাথ বলে ওঠে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনাকে দেখে এখন আমারও একবার সেই নিষিদ্ধ রাজ্যে যেতে ইচ্ছে করছে।

—কেন, আপনারও কেউ আছে নাকি সেখানে?

—হ্যাঁ, আছে। আমার পরম আত্মীয়—আমার স্ত্রী। বলেই সোমনাথ আর দ্বিধা না করে কাজলের কথা আনুপূর্বিক বলতে থাকে অভিমন্যুকে।

শুনতে শুনতে কৌতূহল বেড়ে ওঠে অভিমন্যুর। সোমনাথ থামতেই সে প্রশ্ন করে, ঐ মা-পানের কাছে আপনার স্ত্রীর কোন খবর পেলেন?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় সোমনাথ, হ্যাঁ। তার সেই বৃদ্ধা মা মারা গেছেন। আর, কাজলের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়েছে। তবে সে উচ্চ আদালতে আপীল করেছে বলে এখনও জেলে যেতে হয় নি তাকে। জামিনে ছাড়া পেয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ির মধ্যে আটকে থাকতে হয়। কেউ দেখা করতে পারে না তার সঙ্গে। যাতে সে কোথাও পালিয়ে যেতে না পাবে সেইজন্যেই আদালতের আদেশে এই ব্যবস্থা। তাব বাড়ির সামনে সব সময় পুলিশ মোতায়েন।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে নিজের নিজেব চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে। একসময় অভিমন্যুই নীববতা ভঙ্গ করে। একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে ওঠে, আমার অবস্থা অবশ্যি ঠিক্ আপনাব মত নয়। আপনার কাজল যেখানে আপনাকে দেখতে পেলেই হেসে কাছে ছুটে আসবে, সেখানে আমাব মানস-প্রতিমা সমাপ্তিকা হয়ত আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবারই হুকুম দিয়ে বসবে। কিন্তু সব জেনেশুনে তবুও আমাকে যেতে হবে।

—সেকি ? গুলি করার হুকুম দেবে কেন ? ঐ বাজ্যের কেউকেটা নাকি তিনি ?

—হ্যাঁ, সমাপ্তিকা সেই প্রমীলা রাজ্যেব গভর্ণব। সাংঘাতিক পুরুষ-বিদ্বেষী মহিলা সে।

আবার খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। অভিমন্যুই আবার বললে, তা' যা' হবার হবে। নিজের জন্যে এতটুকু চিন্তা নেই আমার। ওকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেই আমি তৃপ্তি পাবো। তা' আপনি কী করতে চান্? আমার সঙ্গী হবেন নাকি? বলেই অভিমন্যু পকেট থেকে একখানা ম্যাপ্ বের করে নিজের হাঁটুর ওপর মেলে ধরে বললে, এই হচ্ছে সেই দ্বীপের ম্যাপ্। তারপর আঙুল দিয়ে ম্যাপের বিভিন্ন দিক দেখিয়ে আবার বললে, এই দিকটায় আছে পাহাড়। ওখানে মোটর লঞ্চ নোঙর করা চলবে না। আর এ পাশে জঙ্গল। এই জঙ্গলের কাছেই সমুদ্রের পাড়ে লঞ্চ রেখে সোজা পায়ে হেঁটে

রাজধানীতে ঢুকবো। এই জায়গাটা থেকে রাজধানীর দূরত্ব মাইল তিনেকের মত হবে। সমুদ্র শান্ত থাকলে সাত-আট ঘণ্টার মধ্যেই ঐ দ্বীপে পৌঁছতে পারব আমরা। সেখান থেকে হাঁটা পথে ঐ তিন মাইল যেতে বড়জোর আর একঘণ্টা।

—কিন্তু আপনি ওদেশের গভর্ণরকে দেখবেন কেমন করে ?

—সে চিন্তা এখনও করি নি। ওখানে পৌঁছেই যা' হয় ঠিক্ করবো ভেবেছি।

অকস্মাৎ সোমনাথ সোৎসাহে বলে ওঠে, ঠিক আছে। আমিও আপনার সঙ্গী হবো। যে করেই পারি কাজলকে ওখান থেকে উদ্ধার করে আনতেই হবে।

একদিন আগেও যাদের মধ্যে কোন পরিচয় ছিল না, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু তারা একে অন্যের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে প্রয়োজনের তাগিদে।

পরের দিন সমস্ত বিকেলটা অভিমন্যু কাটায় সোমনাথের কোয়ার্টারে। পরামর্শ করে দু'জনে, আলোচনা করে, যুক্তি আঁটে। অবশেষে একসময় অভিমন্যু প্রশ্ন করে সোমনাথকে, মোটর লঞ্চ চালাতে জানেন ? প্রয়োজন হলে লঞ্চ চালিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন তো ?

জবাব দেয় সোমনাথ, এককালে তো পারতাম—সেই কলেজে পড়ার সময়। তারপর অবশ্যি আর চালাই নি।

—কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে। যেতে যেতে ঘণ্টাখানেকের তালিম নেবেন আমার কাছে। তা'হলেই ব্যস ! একেবারে ওস্তাদ !

সোমনাথ আর কিছু না বলে অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে কেবল একটু হাসে। মনে মনে ভাবে, লোকটি তো বেশ ওস্তাদ। আঁট-ঘাঁট বেঁধেই কাজে নেমেছে দেখছি।

॥ নয় ॥

প্রমীলা রাজ্যের জাহাজ এস্ এস্ চন্দনার প্রাক্তন ফার্স্ট ইঞ্জিনীয়ার কাজল আজ গৃহবন্দী। কেউ দেখা করতে পারে না তার সঙ্গে, তবে মাঝে মধ্যে তার মহিলা এ্যাড্ভোকেট এসে মামলার বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা-বার্তা বলে। বাড়ির সামনে রাত দিন পুলিশ পাহারা।

মাসের পর মাস এই বন্দী জীবনে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছে কাজল। বাড়িতে অন্য কোন দ্বিতীয় প্রাণীও নেই যার সঙ্গে দুটো কথা বলে মনটাকে একটু হাল্কা করে নিতে পারে। থাকার মধ্যে একমাত্র ঠিকে ঝি। সে তো সকাল-সন্ধ্যে এসে ঘরের কাজ ও কাজলের জন্যে সামান্য কিছু রান্না-বান্না করে দিয়েই চলে যায়। বাজার-হাটের ভারও তার ওপর।

দোতলা বাড়ির একতলার ঘরগুলো তালা বন্ধ। আগের ভাড়াটেরা চলে যাবার পর আর কেউ ভাড়া নিতে আসে নি। দোতলার ঘর গুলোর অধিকাংশই তালাবন্ধ। একা কাজলের জন্যে একখানা ঘরই যথেষ্ট।

বন্দিনী কাজল এই ক'মাসের মধ্যেই বেশ শুকিয়ে উঠেছে। কণ্ঠার হাড় এখন স্পষ্ট নজরে পড়ে। চিন্তা-ভাবনায় তার চোখের কোণেও কালি পড়েছে। তবুও, এখনও তার দেহে যে সৌন্দর্যটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা' অনেক মেয়েরই ঈর্ষার বস্তু।

দিন-রাত দোতলার জানালার পাশে বসে থাকে কাজল। নীচে বড় রাস্তায় জন-জীবনের স্রোত। সবাই ব্যস্ত। কেবল ব্যস্ততা নেই কাজলের। তার সময় যেন আর কাটতে চায় না। তবুও তো সে এখনও থাকতে পারছে নিজের বাড়িতে। উচ্চ আদালতে আপীলে সে যদি হেরে যায় তো এই সুযোগটুকুও আর সেদিন থাকবে না। সেদিন তার জায়গা হবে উঁচু পাচিল ঘেরা জেলের মধ্যে যেখানে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ একরকম নেই বললেই চলে। সারাটা জীবন সেখানেই কাটাতে হবে তাকে।

দিনের পর দিন এই জানালাটির পাশে বসে চিন্তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় কাজল। মনে পড়ে তার মায়ের কথা। কত কষ্ট করে তাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন তার মা। সেই মা'র মৃত্যুর সময় সে একবার তাঁকে চোখের দেখাও দেখতে পারে নি। তার বিচার চলছিল তখন। সে ছিল তখন জেলে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে।

কাজলের সব চাইতে কষ্ট হয় যখন তার সোমনাথকে মনে পড়ে। কেবলমাত্র বিয়ের রাতটিতেই সে কাছে পেয়েছিল তাকে। সেই একটি রাতের স্মৃতিই অক্ষয় হয়ে রয়েছে তার জীবনে। সারা জীবন ভোর তা' কেবল স্মৃতিই হয়ে থাকবে। এই প্রমীলা রাজ্য থেকে আর কোন দিনই সে বেরোতে পারবে না। কর্তৃপক্ষের কড়া নজর থাকবে তার ওপর। কাজেই এ জীবনে আর দেখা হবে না সোমনাথের সঙ্গে।

সোমনাথ—সোমনাথ। নামটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও ভালো লাগে কাজলের। ঐ নামের মধ্যেই যেন ছড়িয়ে রয়েছে কত আনন্দ!

আচ্ছা, সোমনাথ এখন কি করছে? সে কি কেবল তার হাসপাতাল নিয়েই মেতে আছে? একবারও কি তার মনে পড়ে না কাজলের কথা? কিন্তু মনে পড়লেও বা সে কি করতে পারে? যেমন করেই হোক্ সোমনাথ বোধহয় তার বন্দী জীবনের কথা এতদিনে টের পেয়েছে। হয় তো জানতে পেরেছে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কথা। কিন্তু সে নিরুপায়। হয়তো ইতিমধ্যে সে কাজলের আশা ছেড়েই দিয়েছে। হয়তো সে অন্য একটি মেয়েকে ভালোবেসেছে। হয়তো সে বিয়েও করেছে তাকে। কাজলের জন্যে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করে সে নিজের জীবনটা নষ্ট করবে কেন?

কথাটা মনে হতেই কাজলের সারা শরীরটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। ভারি হয়ে ওঠে চোখের পাতা। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় তার—না—না—না, এ হতে পারে না। সোমনাথ আর কাউকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারে না। সে একমাত্র কাজলের, আর চিরকাল তারই থাকবে।

মাঝে মাঝে কাজল ঈশ্বরকে ডাকে। বলে—হে ঈশ্বর, এ কি বিচিত্র দেশে তুমি পাঠিয়েছ আমাকে। নর-বিদ্বেষী হয়ে এমন ভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মধ্যে সার্থকতা কোথায়? জগতের পুরুষেরা অল্প বেশি স্বার্থপর নিঃসন্দেহে, তাদের আধিপত্যে নারীর অধিকার যে অনেকাংশে খর্ব হয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে একদল যে নারীকে কেবল শারীরিক প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টির যন্ত্র হিসেবে দেখে থাকে তাও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাই বলে, পুরুষের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এমনি আলাদা ভাবে বেঁচে থাকাব কি কোন মূল্য আছে? জীবনের রূপ রস বর্ণ গন্ধকে এমনি ভাবে দূরে ঠেলে দিয়ে বেঁচে থাকা যে সম্পূর্ণ মূল্যহীন তা' কি এ রাজ্যের পুরুষ বিদ্বেষীরা বোঝে না?

কাজলের মনে হয়, হ্যাঁ, এখানকার ডাকসাঁইটে পুরুষ-বিদ্বেষীরা যারা নাকি পুরুষের কোন রকম প্রসঙ্গ উঠলেই আঁৎকে ওঠে, তারাও বোধহয় বুঝতে পারে এরকম ভাবে বেঁচে থাকা একান্তই মূল্যহীন।

হঠাৎ কাজলেব একটা ঘটনা মনে পড়ে। তার কলেজ জীবনের ঘটনা। মধুমিতা ছিল তার কলেজের সহপাঠিনী। পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল সে। নাচ-গান অভিনয়েও সে ছিল সমান দক্ষ।

মধুমিতা ছিল ভয়ানক পুরুষ বিদ্বেষী, পুরুষের নাম-গন্ধও ভালো লাগতো না তার। এ বিষয় তার মনোভাব ছিল খুবই স্পষ্ট। সে বলতো—এই ভালো। এখানে নারীই নারীর ভাগ্য নিয়ন্তা। ঈশ্বব পুরুষের দেহের কাঠামোটা একটু বেশি মজবুত করে তৈরি করেছেন বলে তারা যে আমাদের ওপর লাঠি ঘুরোবে তাব কোন অবকাশ নেই এই রাজ্যে। এই ভালো আছি আমরা, সুখে আছি।

বিরোধী পক্ষের দু'একটি মেয়ে কলেজের কমন রুমে বসে তর্ক করতো মধুমিতার সঙ্গে। বলতো, আচ্ছা মিতা, একটি জলজ্যান্ত পুরুষের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, ঘর বাঁধবি তার সঙ্গে। সে তোকে প্রাণের চাইতেও ভালোবাসবে, তুইও তেমনি ভালোবাসবি তাকে, ঘর

আলো-করা সন্তান আসবে তোর কোলে—এমন একটা চিন্তা কি কোন দিন তোর মনে আসে না?

—না, আসে না। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিত মধুমিতা।

—একমুহূর্তের জন্যেও না?

—না—না, বিশ্বাস কর্ একমুহূর্তের জন্যেও এ চিন্তা আমার মনে কখনও আসে নি।

প্রশ্নকর্ত্রী একটু সময় চিন্তা করে হয়তো আবার বলতো, আচ্ছা, তোর কথাই না হয় বিশ্বাস করলাম যে এমন একটা ভাবনা-চিন্তা কখনও তোর মনে আসে না। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি যে এমন একটা অবস্থা যদি তোর জীবনে কখনও ঘটে তা'হলে তোর কেমন লাগবে?

—খুব খারাপ, দারুণ খারাপ। স্পষ্ট উত্তর দিতো মধুমিতা।

—সত্যি বলছিস্?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি। ভালোবাসাই বলিস্ আর যাই বলিস, একটা পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার কথা মনে হলেই দারুণ খারাপ লাগে আমার। অবশ্যি বলতে পারিস, এদেশের আইন কানুনের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করি বলেই হয়তো আমার মনের কাঠামোটা এমনিভাবে তৈরি হয়েছে। তবে, আমি আশা করবো যে আমাদের দেশের প্রতিটি মেয়েরই উচিত এই মনোভাব গ্রহণ করা। একজন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হওয়ার মধ্যে আর যাই থাকুক সম্মান থাকে না, তার সন্তানের জননী হওয়ার মধ্যে আর যাই থাকুক গৌরব কিছু থাকে না।

—কিন্তু কেউ যদি তোর এই মনোভাব মেনে নিতে না পারে?

জবাব দিতো মধুমিতা, তা'হলে তাকে বলবো দেশদ্রোহিনী। তার উচিত এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া।

—কিন্তু এদেশ ছেড়ে কোন মেয়ের তো বাইরে চলে যাওয়ার উপায় নেই। কর্তৃপক্ষ তো সে অনুমতি দেয় না।

—তা'হলে তাকে তার মত পাল্টে এদেশেই ভদ্রজীবন যাপন করতে হবে।

—তুই কি বলতে চাস্ পুরুষ-সঙ্গ কামনা করা অভদ্রজনোচিত ?

জোরের সঙ্গেই বলে উঠতো মধুমিতা, হ্যাঁ, একশোবার। পুরুষের সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্খা কেবল অভদ্রজনোচিতই নয়, দারুণ অবমাননাকর।

—তা'হলে কি নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না ?

—হ্যাঁ পারে, মেয়েরা পারে সত্যিকারের প্রেমিকা হতে, কিন্তু পুরুষ সত্যিকারের প্রেমিক হতে কোন কালেই পারে না। ওটা কেবল ওদের কথার কথা। মেয়েদের মন ভুলিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করার এক জঘন্য প্রচেষ্টা।

তর্কে পেরে না উঠে প্রশ্নকর্ত্রী শেষে বলতো, আচ্ছা মিতা, তা'হলে তুই বলতে চাইছিস পুরুষ সম্বন্ধে কোন মোহ তোর নেই ?

—না, জবাব দিতো মধুমিতা, মোহই বলো, প্রেমই বলো আর হৃদয়াবেগই বলো, কোন কিছুই আমার নেই পুরুষ সম্বন্ধে। ওদের আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

গ্রীষ্মের ছুটির আগে নাটক হবে কলেজে। অনেক নাটকের বই ঘাঁটাঘাঁটির পরে 'স্থির হলো বিদেশের একজন মহীয়সী নারী বিষ্ণু-প্রিয়ার জীবন-চরিতের ওপর লেখা একখানি নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। এই নাটকে একটিমাত্র পুরুষ চরিত্র—নিমাই। এটি ছাড়া সম্পূর্ণ পুরুষ বর্জিত নাটক আর পাওয়া গেল না।

কলেজে ছুটির পরে পুরোদমে রিহার্সাল চলছে। ইকনমিক্সের অধ্যাপিকা শান্তিদি পরিচালিকা। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকার অভিনয় করবে মধুমিতা। সে-ই হচ্ছে এই ভূমিকার সবচাইতে উপযুক্ত।

কিন্তু নিমাই হবে কে? বিদেশের এই মানুষটি সত্যিকারের ভগবৎ প্রেমিক হলেও পুরুষ তো বটে! তা'ছাড়া নিমাই এমন একজন স্বার্থপর পুরুষ যে নাকি ঈশ্বর লাভের স্বার্থে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। স্বার্থপর পুরুষ জাতির একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এই নিমাই। এই পুরুষের চরিত্রে কে অভিনয় করবে?

কলেজে মেয়েদের মধ্যে যাদের অভিনয়ে কিছুমাত্র দক্ষতা আছে তারা কেউই পুরুষের বেশে পুরুষ চরিত্রের অভিনয় করতে ইচ্ছুক নয়। আবার যারা ইচ্ছুক, তাদের অভিনয় দক্ষতা বলে কিছু নেই। অবশেষে অনেক বলা-কওয়ার পরে তন্দ্রা নামে একটি মেয়ে রাজি হলো। মোটামুটি অভিনয় করতে পারতো মেয়েটি। পরিচালিকা শান্তিদি তন্দ্রাকে গড়ে-পিটে উপযুক্ত করে তোলার ভার নিলেন।

কিন্তু রিহার্সালেই বোঝা গেল মধুমিতা ও তন্দ্রার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। মধুমিতা যেখানে মনের আবেগে অভিনয় করে তন্দ্রা সেখানে তোতাপাখীর মত কেবল শেখানো বুলি আউড়ে যায়। কাজেই দু'জনের অভিনয়ের মধ্যে সমন্বয় আনা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

শান্তিদির কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তিনি নিমাইয়ের জীবন চরিত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে শোনালেন তন্দ্রাকে। তারপর তাকে নির্দেশ দিলেন নিজের মনটিকে ঐ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে অভিনয় করতে। বললেন, ভাবো—ভাবতে চেষ্টা করো যে তুমি হচ্ছো স্বয়ং সেই নিমাই। ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা, ঘর-সংসার, পরিবার-পরিজন সব কিছুই তোমার কাছে অকিঞ্চিৎকর। এমনি একটা চিন্তাকে মনের মধ্যে রেখে অভিনয় করে যাও। দেখবে তোমার অভিনয়ও মধুমিতার মত প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

অবশেষে এসে গেল অভিনয় রজনী। কলেজের শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রী ও তাদের আত্মীয়াদের উপস্থিতিতে শুরু হলো অভিনয়—বিষ্ণুপ্রিয়া।

চমৎকার অভিনয় করে চলেছে মধুমিতা। তন্দ্রা ও অন্যান্যরা ম্লান

হয়ে গেছে তার কাছে। তার আবেগপূর্ণ অভিনয়ে দর্শকেরা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাকে।

নাটকের শেষ দৃশ্যেই মধুমিতা তার অভিনয় দক্ষতার চরম উৎকর্ষ ঘটালো। নিমাইয়ের গৃহত্যাগের দৃশ্য সেটা। গভীর রাতে স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে একা শয্যায় ফেলে রেখে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন নিমাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়া আর দেখতে পেলেন না তাঁকে। আকুল হয়ে উঠলেন তিনি। শোকে-দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

এই দৃশ্যে মধুমিতা এমন অভিনয় করলো যে বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ যেন আঘাত করলো প্রতিটি দর্শকের মনে। মধুমিতার দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেল তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস, মধুমিতার চোখের জলের সঙ্গে মিশে গেল তাদের চোখের জল। মধুমিতার হাহাকারের সঙ্গে তাদের জীবনের হাহাকারও যেন মিশে একাকার হয়ে গেল।

হঠাৎ কি যেন হলো। বিষ্ণুপ্রিয়া জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো মঞ্চের ওপর। দর্শকেরা প্রথমটায় এটাকেও অভিনয় বলে ভুল করেছিল। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙ্‌লো একটু পরেই। না, অভিনয় নয়। অজ্ঞান হয়ে পড়েছে মধুমিতা।

ধরাধরি করে মধুমিতাকে নিয়ে যাওয়া হলো পর্দার আড়ালে। জল দেওয়া হলো মাথায়, হাওয়া করা হলো। কেউ বললে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল এটা। কেউ বললে, দুর্বলতা।

জ্ঞান ফিরে এলো মধুমিতার। লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো সে। স্বামী হারানোর দুঃখ কেমন করে এমন সত্যি হয়ে উঠ্‌লো তার প্রাণে? সে তো অভিনয় করতেই চেয়েছিল। জ্ঞানতঃ অভিনয় ছাড়া আর কিছুই সে করে নি। তা'হলে এখনও তার মন কেন এমনভাবে গুমরে গুমরে কাঁদছে? অভিনয় তো শেষ হয়েছে। তবে কেন প্রিয়তমকে হারানোর বেদনায় মনটা এখনও এমন ভাবাক্রান্ত হয়ে রয়েছে? তবে কি সেটা কেবল অভিনয়ই ছিল না? তার বাইরে আরও কিছু ছিল

নাকি ? তা'হলে কি তার মনের গহনতলে ঘুমিয়ে ছিল এমন একটি ক্ষুদ্র বাসনা যা নাকি অভিনয়ের মেকি আঘাত পর্যন্ত সহ্য করতে পারে নি সেই মুহূর্তে ? কথাটা যতই চিন্তা করছিল ততই নিজের কাছেই সংকোচবোধ করছিল মধুমিতা। প্রকৃতির এ কি বিচিত্র নিয়ম! কেন এমন ঘটে ? পুরুষ-বিদ্বেষের শক্ত আবরণের নীচে এ কোন্ ফল্গুধারা ? একেই কি বলে প্রেম ?

মধুমিতা তার এই মনের কথাটি বরাবর গোপন করে রাখতে পারলেও একদিন কিন্তু বলে ফেলেছিল। বলেছিল তার বান্ধবী কাজলকে। শুনে, কাজল কেবল একটু হেসেছিল সেদিন।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে কাজলের। দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় ঠিকা ঝি লছমী।

—কিরে লছ্মী, কিছু বলবি নাকি ? ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করে কাজল।

—নেহি মাইজী, জবাব দেয় লছ্মী, আমার কাজ হয়ে গেছে। আমি চলে যাচ্ছি। রাতের খাবার ঢেকে রেখেছি। কালকের মত যেন আবার খেতে ভুলে যাবেন না।

—না'রে না, একটু ম্লান হেসে বলতে থাকে কাজল, আমার জন্যে তুই এত ভাবিস্ কেন রে ?

—আমি ভাবনা করতে যাবো কেন ? বলেই লছমী কাজলের প্রায় গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকে, আচ্ছা দিদি, দাদাজীকে কোনরকমে একটা খবর ভেজা চলে না ?

—দাদাজী ? চম্‌কে ওঠে কাজল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। দাদাজী, যিনি আমার এই দিদিকে সাদী করেছেন।

—চুপ্—চুপ্! চারিদিকে একবার তাকায় কাজল। তারপর তেমনি নীচু কণ্ঠে আবার বলতে থাকে, এসব কথা উচ্চারণ করবি না।

জানিস না দেওয়ালেরও কান আছে? কে কোত্থেকে শুনে আমার মত তোকেও বিপদে ফেলবে তার কি কিছু ঠিক আছে?

লছ্‌মী বললে, বেশ, আর কখনও বলবো না। এবার তবে বলুন, তাঁকে একটা খবর দেওয়া যায় না?

—কেমন করে? প্রশ্ন করে কাজল।

—চিঠি লিখে। জবাব দেয় লছ্‌মী।

কাজল কোন জবাব না দিয়ে কেবল একটু ম্লান হাসে। লছ্‌মী মূর্খ। সে লেখাপড়া জানে না। বিদেশের সঙ্গে যে এদেশের চিঠি-পত্রেরও কোন যোগাযোগ নেই একথাটা সম্ভবতঃ লছমীর জানা নেই। জানা থাকলে সে এই প্রশ্ন করতো না।

কাজল মাথা নেড়ে বললে, না'রে, তা' হয় না।

লছমী চলে যায়। কাজল আবার ডুবে যায় নিজের চিন্তায়।

চিন্তাস্রোতে আবার বাধা পড়ে কাজলের। নীচে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। পুলিশ ভ্যান। ভ্যান থেকে নেমে আসে বন্দুক হাতে কয়েকজন মেয়ে-কন্‌স্টেবল। ওরা আগের দলটিকে বদলি করতে এসেছে।

প্রথানুযায়ী সারিবদ্ধ হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায় দু'দল। বন্দুক হাতে পরস্পরকে সেলাম জানায় তারা। তারপর পুরানো দল গিয়ে গাড়িতে ওঠে। চলে যায় পুলিশ ভ্যান। থেকে যায় নতুন দলটি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একটি দুটি করে আলো জ্বলে উঠেছে সহরের চারিদিকে। কাজলদের বাড়ির প্রায় উল্টোদিকে একটা সিনেমায় দারুণ ভিড়। অধিকাংশই অল্প বয়সের মেয়ে। পরনে তাদের বেল্‌-বটম্‌, গায়ে মেয়েদের হাওয়াই সার্ট। রুক্ষ চুলগুলো কারুর বা বেণী বাঁধা, কারুর বা আলগা খোঁপা। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন প্রায় নেই বললেই চলে, কারণ প্রসাধন না করাই আধুনিকতা। কানে, গলায় কিম্বা হাতেও নেই কোন সোনাদানার চিহ্ন। হাতের কব্জির সঙ্গে ঢলঢলে করে বাঁধা বড় আকারের রিস্টওয়াচ। কিছু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কিম্বা ইউরোপীয়ান মেয়ের মুখে সিগারেট।

ভিড়ের মধ্যে কয়েকটা মেয়ে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ে হৈ হুল্লোড় করছে। সভ্যতা-ভব্যতার ধার ধারে না তারা। সমাজে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে এবা। লেখা-পড়া শেখে নি। কে কারখানায় মজুরের কাজ করে, আর সন্ধ্যায় এসে ভিড় করে সিনেম সামনে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ সুযোগ পেলে ছিনতাই করতে ছাড়ে না।

বেকারহীন এ'দেশে মস্তান গোছের কিছু মেয়েও রাস্তা-ঘাটে চোখে পড়ে। মার-দাঙ্গা করতেও তারা ওস্তাদ। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মার খায়। দু'দশ দিন জেল খাটে, ছাড়া পেয়ে আবার এসে রাস্তায় দাঁড়ায়। সুষ্ঠু নিরুদ্বিগ্ন জীবন এদের ধাতে সয় না। তাই চাকরিতে তেমন একটা রুচি নেই এদের।

জানালার কাছে বসে প্রমীলা জগতের এই জীবন যাত্রা দেখতে দেখতে একসময় ক্লান্ত হয়ে ওঠে কাজল, সরে আসে জানালার কাছ থেকে। কিছুই যেন আর ভালো লাগে না। শোনার মত কিম্বা দেখার মত কোন প্রোগ্রাম না আছে রেডিওতে, না আছে টি-ভি'তে। সেই একঘেয়ে জিনিস।

হঠাৎ লছমীর কথা মনে পড়ে কাজলের। দাদাজীর কাছে চিঠি লেখার কথা বলেছিল সে। হায়রে, এদেশে তা' হবার নয়। এদেশে কোন কাগজের টুকরো কোন বিরহিনীর বুকের ব্যথা কালির অক্ষরে বয়ে নিয়ে যায় না বিদেশের কোন বিরহীর কাছে। তা' যদি যেতো তা' হলে এতদিনে কাজল দিস্তা দিস্তা চিঠি লিখতো সোমনাথের কাছে।

কিন্তু নাই বা পৌঁছল সেই চিঠি সোমনাথের কাছে, তাই বলে লিখতে দোষ কি? লেখার আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত করবে কেন নিজেকে? হ্যাঁ, কাজল চিঠিই লিখবে সোমনাথকে। সেই চিঠি কোনদিন সোমনাথের হাতে পৌঁছবে না জেনেও সে চিঠি লিখবে। চিঠির বোঝা যখন ভারি হয়ে উঠবে তখন তা' ছিঁড়ে ফেলে আবার

লিখতে বসবে। নিজেব মনের কথা উজাড় করে ঢেলে দেবে চিঠির ছত্রে ছত্রে।

যে চিঠি কোনদিন আলোর মুখ দেখবে না সেই চিঠিই অবশেষে কাজল লিখতে বসলো তাব প্রিয়তমকে।

একখানা ছবির প্রেমে পড়ে স্বাগতা সবকিছু ভুলেছে। ভুলেছে নাচ-গান, খেলা-ধুলো। ভুলেছে জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ সবকিছু।

খেলা-ধূলোতে ববাবরই পটু স্বাগতা। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি—সব খেলাতেই সে ছিল তার কলেজের সেরা ছাত্রী। কলেজের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে তাব। ইচ্ছে কবে বন্ধ করে নি স্বাগতা। জেল-বাসের একটি বছব সে কলেজেব সঙ্গে সম্পর্ক বাখতে পাবে নি। সেই থেকেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ্।

কিন্তু কলেজেব খেলোয়াড় ছাত্রীবা নাছোড়বান্দা। তারা একদিন এসে ধরে পড়লো স্বাগতাকে ফুটবল খেলার জন্যে। আন্তঃ কলেজ ফুটবল ম্যাচের ফাইন্যাল। স্বাগতা দলে না থাকলে তাদেব দলের ভরাডুবি অনিবার্য। তা'ছাড়া এই ম্যাচে অংশ গ্রহণ করলে বিদেশে যাবার একটা সুযোগও আসতে পারে।

জবাবে স্বাগতা বললে, তা' কি করে হয়? আমি তো আর এখন ঐ কলেজের ছাত্রী নই।

একজন জবাব দেয়, কলেজ থেকে তো নাম কাটাস্ নি তুই। বাজেই এখনও তুই ছাত্রীই আছিস্। তোকে খেলতেই হবে।

সত্য বলতে কি, ইদানীং আর এসব খেলাধূলো স্বাগতার ভালো লাগে না। কেবলই তাব মনে হয়, এসব করে কি হবে? নারীর আসল পাওনাটুকুই যখন পেলাম না, তখন বেঁচে থাকাটাই তো অর্থহীন।

তবুও বান্ধবীদের অনুরোধ ঠেলতে পারে না স্বাগতা। অনিচ্ছা সত্বেও রাজি হতে হয় তাকে।

খেলার দিন মস্তবড় স্টেডিয়ামে আর তিল ধারনের জায়গা নেই।

চারিদিকেই লোক আর লোক। এবারের এই ফাইন্যাল ম্যাচের বিশেষ আকর্ষণ এই যে এই দুটো দল থেকেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত করে তাদের বিদেশ ট্যুরের ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রথম বিদেশ ট্যুরের জন্যে সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে। এ জন্যে খেলার কর্মকর্ত্রীদের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

খেলার মাঠের সাজ-সজ্জাও আজ একটু অন্যরকম। স্বয়ং গভর্ণর আজ উপস্থিত থাকবেন খেলার মাঠে। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেবেন তিনিই।

শুরু হলো খেলা। দু'পক্ষই সমান শক্তিধর। খেলার প্রথম অর্ধে গোল করতে পারলে না কোনপক্ষই।

মাঠে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকের দৃষ্টি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছিল স্বাগতার ওপর। সে-ই আজ মাঠের সেরা খেলোয়াড়।

ঘোড়াকে রেসের মাঠে নিয়ে গেলে সে যেমন ছুটবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, স্বাগতার অবস্থাও আজ ঠিক তেমনি। প্রথমে যে রাজিই হয় নি খেলতে, সে-ই কিন্তু মাঠে নেমে সম্পূর্ণ বদলে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো গোল করার জন্যে। বিদ্যুৎ শিখার মত ছুটতে লাগলো বলের পিছু পিছু। এই দারুণ গ্রীষ্মে নব্বই মিনিটের খেলায়ও যেন সে ক্লান্তিহীন।

অবশেষে গোল হলো। দ্বিতীয়ার্ধে পর পর দু'টো গোল দিলে স্বাগতাদের দল। দু'টো গোলই হলো স্বাগতার পায়ে।

বিজয়ী হলো স্বাগতাদের কলেজ। খেলা শেষে স্বাগতাকে কাঁধে তুলে মেয়েরা প্রদক্ষিণ করলো সারা মাঠ। অবশেষে তারা এসে জড়ো হলো আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বয়ং গভর্ণরের সামনে।

গভর্ণর সমাপ্তিকাও আজ খুব খুশি। এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন খেলা সে অনেককাল দেখে নি। বিদেশে থাকতে সে মেয়েদের ফুটবল দেখেছে কিন্তু সেখানেও পুরুষদের মত ফাউলের ছড়াছড়ি। যেন তেন প্রকারে একদলের ওপর অন্যদলের টেক্কা দেওয়ার এক লজ্জাকর প্রচেষ্টা।

মাঠের মধ্যে স্বাগতার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে না পেলেও ঐ সাত নম্বর খেলোয়াড়ই যে আজ মাঠের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সে বিষয়ে গভর্ণর সমাপ্তিকারও কোন সন্দেহ ছিল না। সত্যিই অপূর্ব তার ক্রীড়া দক্ষতা। এই মেয়েটিই হয়তো একদিন বিশ্ব নারী-ফুটবলে অংশ গ্রহণ করে তার দেশেব মুখ উজ্জ্বল করবে।

বিজয়ী দলের খেলোয়াড়েরা দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ হয়ে। স্বাগতাও দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে। মনটা আজ খুশিতে ভরপুর। অনেক দিন পরে তার মুখে আজ হাসি ফুটেছে। দলেব অন্য মেয়েরাও হাসি-খুশি। প্রত্যেকের মনের কোণেই উঁকি দিচ্ছে এক গোপন ইচ্ছে। নির্বাচিত হতে পারলে বিদেশে যেতে পারবে। বিদেশে পাড়ি দেওয়ার মত এক অচিন্ত্যনীয় সুযোগ ও অপূর্ব সম্মানের অধিকারিণী হবে। প্রমীলা রাজ্যের ইতিহাসে একদল মেয়ের কাছে এই সুযোগ এসেছে এই প্রথম।

প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মনের কোণে আশার আলোর সঙ্গে সঙ্গে একটুকরো শঙ্কার মেঘও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, পারবে তো সে নির্বাচিত হতে? তবে একজনের বিষয়ে তারা প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহ। সে হচ্ছে স্বাগতা। স্বাগতা যে নির্বাচিত হবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে স্বাগতাও সেই কথাই চিন্তা করছিল। সে নির্বাচিত হবেই। বিদেশে পাড়ি দেওয়ার এক অকল্পনীয় সুযোগ এসেছে তার সামনে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে তাকে। তার মনের আয়নায় যে মানুষটির ছবি স্পষ্ট ভাবে সে ধরে রেখেছে, যে না-দেখা মানুষটির কল্পনায় তার সারা দেহ-মন অসাড় হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে তার চোখের তারা, শিউরে ওঠে তার সর্বাঙ্গ সেই অভিমন্যুকে খুঁজে বের করতে হবে। 'এর জন্যে যদি তাকে দল-ছাড়া হয়ে পালিয়ে যেতে হয় তাতেও তার আপত্তি নেই।

কিন্তু সেই অভিমন্যুর কাছে গিয়ে সে কি করবে? কেমন করে তার কাছে খুলে বলবে নিজের মনের কথা? তার এই উনিশ বছর

কুমারী জীবনের অর্ঘের ডালি কেমন করে সে তুলে দেবে অভিমন্যুর হাতে ?

ওসব চিন্তা করার সময় এখনও আসে নি স্বাগতার। দু'চার দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে নির্বাচিতের তালিকা, তারপরেই স্বাগতা তৈরি করবে তার পরিকল্পনা।

চিন্তায় বাধা পড়ে স্বাগতার। বিজয়ী দলের দলনেত্রীর হাতে গভর্ণর তুলে দিচ্ছে ট্রফি। দর্শকদের মধ্যে জেগে উঠেছে আনন্দ কোলাহল। চিত্র-সাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশগান ঝল্‌কে উঠছে।

এবার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে দেওয়া হবে তার নিজস্ব ট্রফি। ডাক পড়লো স্বাগতার। মনটা চন্‌মন্ করে ওঠে। সুন্দর ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় স্বাগতা গভর্ণরের দিকে। গভর্ণর সমাপ্তিকার মুখেও স্মিত হাসি।

হঠাৎ কি যেন হলো। হাসির রেশটুকু অদৃশ্য হয়ে গেল সমাপ্তিকার মুখের ওপর থেকে। সেখানে জেগে উঠলো এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য।

দুরু দুরু বক্ষে স্বাগতা গিয়ে দাঁড়ায় গভর্ণরের সামনে। সমাপ্তিকার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কর্মকর্ত্রী ট্রফিটি এগিয়ে দেয় গভর্ণরের দিকে। ট্রফিটি হাতে তুলে নেয় সমাপ্তিকা, তার মুখের গাম্ভীর্যের ওপর এবার জেগে ওঠে ক্রোধের চিহ্ন। শঙ্কিত হয়ে ওঠে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তার এডিকং।

চিনতে পেরেছে সমাপ্তিকা। চিনতে পেরেছে এই মেয়েটাকে। মনে পড়ে তার ম্যাসকিউলিনা পত্রিকাটির কথা, মনে পড়ে তার সেই পত্রিকায় ছাপা অভিমন্যুর ছবিখানার ওপর এই মেয়েটার নিজের হাতে লেখা সেই লাইন ক'টি, মনে পড়ে তার এই মেয়েটার দণ্ডের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার কথা।

সেই মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সমাপ্তিকা ট্রফিটি তুলে দেয় স্বাগতার হাতে। তারপর নিয়ম মত দায়সারা গোছের করমর্দন করে তার সঙ্গে। স্বাগতা অনুভব করে গভর্ণরের হাতখানি যেন একটু অতিরিক্ত শীতল।

আনন্দ ও শঙ্কার এক মিশ্র অবস্থার মধ্যে একটি দু'টি করে সাতটি দিন অতিবাহিত করে স্বাগতা। অবশেষে জানা গেল নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম। সেই তালিকায় স্বাগতার নাম নেই।

খেলার কর্মকর্ত্রীরা অনেক আবেদন নিবেদন করেছিল গভর্ণর সমাপ্তিকার কাছে, কিন্তু সমাপ্তিকা অটল। আইন ভঙ্গকারী একটি জেলখাটা মেয়েকে সে কিছুতেই অনুমতি দিতে পারে না বিদেশে পাড়ি দিতে। সেখানে গিয়ে সে আরও কিছু অনাসৃষ্টি কাণ্ড করে বসতে পারে, চূন-কালি মেখে দিতে পারে স্বদেশের মুখে।

কেবলমাত্র দেশের সম্মানের কথা ভেবেই কি সমাপ্তিকা স্বাগতাকে বিদেশে যাবার অনুমতি দেয় নি? এর মধ্যে কি আর কিছু ছিল না? স্বাগতা বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়ে মনের যে গোপন বাসনা পূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছিল, গভর্ণর সমাপ্তিকার মনেও কি উদয় হয়েছিল সেই সম্ভাবনার কথা? সেই আশঙ্কাতেই কি সে ভেস্তে দিতে চেয়েছিল স্বাগতার পরিকল্পনা? মনের বাসনা অপূর্ণই রয়ে গেল স্বাগতার।

স্বাগতার মা মেয়ের মধ্যে হঠাৎ উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার লক্ষ্য করে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছিলেন, এতদিনে বুঝি সেই ছবির ভূত মেয়েটার কাঁধ থেকে নেমে গেছে।

কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই তিনি টের পেলেন যে সেই ভূত সত্যিই নেমে যায় নি। সেটা যেন এবার আরও বেশি করে চেপে ধরেছে তাঁর মেয়েকে। স্বাগতা এখন প্রায় অর্দ্ধ উন্মাদ, ছবির প্রেমে সে আত্মহারা—দিশেহারা।

॥ দশ ॥

দুঃসাহসী এক অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্যে অভিমন্যু ও সোমনাথ প্রস্তুত। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে কয়েকদিন সময় লাগলো তাদের। সমুদ্রগামী একখানা মোটর লঞ্চের জোগাড় করতে হলো।

অবশেষে একদিন বেলা বারোটা নাগাদ গোপনে তারা যাত্রা করল সমুদ্র-ঘেরা সেই প্রমীলা রাজ্যের উদ্দেশে যেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ—যেদেশে কোন পুরুষ কোনদিন প্রবেশ করেনি—যেদেশে সুদূর অতীতে এক কৌতূহলী বিদেশী পুরুষ পর্যটক প্রবেশ করতে চেষ্টা করে সতর্ক প্রহরীদের গুলির মুখে জীবন দিয়েছিল। সেই নিষিদ্ধ রাজ্যে পদার্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল দু'জন যুবক—একজন ডাক্তার, আর অন্যজন ইঞ্জিনীয়ার।

যে বস্তুর আকর্ষণে রাজা স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করে সাধারণ নাগরিক হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, যে বস্তুর আহ্বানে ধনী নিঃস্ব হয়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, যে বস্তুর প্রেরণায় যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে কত কাব্য, কত সঙ্গীত, সেই অতি পুরাতন আবার চিরনতুন প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণেই সাগরে ভেলা ভাসাল দুই দুঃসাহসী পুরুষ—অভিমন্যু ও সোমনাথ।

যাবার আগে সোমনাথ একবার জিজ্ঞেস করেছিল অভিমন্যুকে, সঙ্গে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নেওয়ার দরকার নেই?

—বলছেন কি আপনি? নারী হত্যা করতে পারবো না কিছুতেই।

—আক্রান্ত হলেও না?

—না। তা'হলেও না।

একটুসময় ভেবে নিয়ে আবার বলেছিল সোমনাথ, কিন্তু সেই জঙ্গলের মধ্যে বন্যপশুর হাত থেকে বাঁচতে হলেও তো কিছু অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন।

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল অভিমন্যু, আমি ভালমত খবর নিয়েছি। ঐ জঙ্গলে হরিণ খরগোশের মত কিছু নিরীহ প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নেই।

শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে টপ্ স্পীডে মোটর লঞ্চ চলল প্রায় ঘণ্টা সাতেক। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই নিষিদ্ধ রাজ্য। ষ্টীয়ারিংয়ের সামনে বসেছিল সোমনাথ। উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে সেই দ্বীপের দিকে তাকিয়েছিল

সে। আর পাশে বসে তাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল অভিমন্যু। সামনে তার খোলা ম্যাপ্। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই লঞ্চ চালনায় নিজের পুরনো অভ্যেস ফিরে পেয়েছিল সোমনাথ।

একসময় অভিমন্যু বলে ওঠে, আর বড়জোর মাইল দু'য়েক বাকি। এবার খুব সাবধানে যেতে হবে আমাদের। খুব সতর্কভাবে চালাতে হবে লঞ্চ। আপনি বরঞ্চ এই বাইনাকুলারের সাহায্যে দ্বীপের দিকে লক্ষ্য রাখুন। আমি এবার চালাই। বলেই সোমনাথকে সরিয়ে দিয়ে স্টীয়ারিং হুইলটা শক্ত হাতে চেপে ধরে অভিমন্যু। অবশেষে একসময় দ্বীপের একপাশে ঘন জঙ্গলের কাছে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় লঞ্চটা।

সমুদ্র এখানে খুবই শান্ত। অল্প অল্প ঢেউ। অভিমন্যু ও সোমনাথ লঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে লোহার শেকল বাঁধা নোঙর দুটো আটকে দেয় পাড়ের বালির ওপর। অল্প অল্প দুলতে থাকে সেই ছাই রংয়ের লঞ্চটা।

একমুহূর্ত সতর্কদৃষ্টিতে চারিদিক দেখে নেয় তারা। টর্চের মৃদু আলোয় ম্যাপের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় অভিমন্যু। তারপর তারা এগিয়ে যায় জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। ছোট টর্চের আলোয় পথ চলতে থাকে অভিমন্যু ও সোমনাথ। মানুষের সাড়া পেয়ে রাতের পাখীর ঝটপটি থেমে যায়। তারা বোধহয় বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে—এরা আবার কারা? বিচিত্র পোশাকে এ আবার কী ধরনের জীব? মানুষের আবার এরকম চেহারা হয় না কি? মুখে-গালে এমন দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন থাকে নাকি?

যেতে যেতে নীচু কণ্ঠে অভিমন্যু সোমনাথকে জিজ্ঞেস করে, আপনার স্ত্রীর বাড়ির ঠিকানা আপনি জানেন?

কিন্তু জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই অনেকটা নিজের মনেই অভিমন্যু আবার বলে ওঠে, ঠিকানা জানলেও অবশ্যি তেমন একটা

কাজে লাগবে না, কারণ এখানকার পথঘাট তো কিছুই চিনি না আমরা। তা'ছাড়া রাত গভীর না হলে তো সহরে প্রবেশ করাও বিপজ্জনক। তাই ভাবছি—

—কিছুই ভাবতে হবে না আপনাকে। বলতে থাকে সোমনাথ, বাড়ির ঠিকানা না জানলেও কাজলের বাড়ি চিনতে আমার অসুবিধে হবে না।

—কেমন করে? বিস্মিত কণ্ঠস্বর অভিমন্যুর।

জবাব দেয় সোমনাথ, কথায় কথায় কাজল একদিন বলেছিল, রাজধানীর ঠিক্ মাঝামাঝি জায়গায় নাকি একটা খুব উঁচু কালীমন্দির আছে। কোন পুরুষ দেবতার পূজো হয় না বলেই স্ত্রী দেবতার পূজোর ঘটা এদেশে। এখানেও অবশ্যি মা কালীর পায়ের নীচে শুয়ে থাকে শিব। শিব পুরুষ হলেও কালীর পায়ের তলায় তাঁকে রাখতে আপত্তি নেই এদের। বোধহয় এতে মনে মনে খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে এরা। ঐ মন্দিরটা নাকি কলকাতার মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু। রাতে তার চূড়োয় আলো জ্বলে। ঐ আলো নগরীর যে-কোন প্রান্ত থেকেই নাকি দেখা যায়। মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকে আছে সারি সারি চার-পাঁচতলা বাড়ি। তারই দু'টো চারতলা বাড়ির ঠিক্ মাঝখানেই কাজলদের দোতলা বাড়ি।

সোমনাথ থামতেই অভিমন্যু বললে, আপনার স্ত্রীর বাড়িতে পুলিশ পাহারা আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, মা-পান্ তো সেই রকমই বলেছিল।

চলতে চলতে মনে মনে কি যেন হিসেব করতে থাকে অভিমন্যু। তারপর একসময় মুখ তুলে আবার বললে, আগে আপনার স্ত্রীর বাড়িতেই আমরা যাবো। সেখানে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে আপনার স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে এই জঙ্গলেই আপনারা লুকিয়ে থাকবেন। পরের দিন রাতে গভর্ণর হাউসে প্রবেশ করতে গিয়ে যদি আমি কোনরকমে ধরা পড়ে যাই তো লঞ্চ নিয়ে আপনারা পালিয়ে যাবেন।

—সারাটা দিন আপনি তা'হলে কোথায় থাকবেন?

—থাকবো গভর্ণর হাউসের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে।

—আপনাকে এখানে একা ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাবো? প্রশ্ন করে সোমনাথ।

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় অভিমন্যু, হ্যাঁ, আমার একার জন্যে সবাই মিলে বিপদে পড়ার মধ্যে কি কোন সার্থকতা আছে? বলতে বলতেই গাছের শেকড়ে একটা হোচট্ খেয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নেয় অভিমন্যু।

একসময় শেষ হল জঙ্গল। এরপর থেকেই আরম্ভ হয়েছে শহরতলী এলাকা। তারপরই আসল সহর।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা। নিজের হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে অভিমন্যু চুপিচুপি সোমনাথকে বললে, এখনই আর এগিয়ে যাওয়া উচিত নয় আমাদের। বেশি রাত হয় নি। কারুর চোখে পড়ে গেলে আর নিস্তার নেই।

একটা গাছেব গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই অভিমন্যু ও সোমনাথ চুপ্ করে বসে থেকে নিষিদ্ধ রাজ্যে পা দেওয়ার রোমাঞ্চ অনুভব করতে থাকে মনে মনে।

রাত গভীর হয়। রাস্তা জনমানবশূন্য। সহরতলী এলাকাতেও রাস্তার দু' পাশে টিউব লাইটের প্রখর আলো। মাঝেমধ্যে পাহারায় রত নারী পুলিশের জুতোর খট্খট্ শব্দ।

সহরতলী ছাড়িয়ে এবার সহর এলাকা।

এখানেও রাস্তা জনহীন। বাস্তায় আলোর বন্যা। পুলিশের টহলদারী গাড়ি ছুটে চলেছে মাঝে মাঝে। গাড়ির মধ্যে পোশাকপরা সুন্দরী ললনারা।

বাড়ির অন্ধকার ছায়ায় পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছিল অভিমন্যু ও সোমনাথ। ভাগ্য ভাল, এদেশের রাস্তায় বোধহয় কুকুর নেই। থাকলে, ওদের উৎপাতে ধরা পড়তে বেশি সময় লাগত না তাদের।

এগিয়ে চলেছে সোমনাথ ও অভিমন্যু। লক্ষ্য তাদের উঁচু মন্দির-চূড়োর সেই উজ্জ্বল লাল আলোর দিকে। সাবধানী অভিমন্যু কিন্তু চল্‌তে চল্‌তে রাস্তাঘাটও চিনে নিচ্ছিল ভাল করে।

অবশেষে তারা এসে হাজির হল সেই কালী মন্দিরের কাছে। মিথ্যে বলে নি কাজল, কালী মন্দিরের চূড়োটা কলকাতার মনুমেন্টের চাইতেও অনেক বেশি উঁচু। পথহারা পথিকদের ধ্রুবতারার কাজ করে ঐ চূড়োর আলো।

কাজলের দোতলা বাড়িটা চিনে নিতে তেমন অসুবিধে হয় না তাদের। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা পুলিশ জীপ। আর বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে টুলের ওপর বসে মৃদুকণ্ঠে গল্প করছে জনতিনেক পুলিশ কর্মচারী। তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো কথার মধ্যে মেয়েলী কণ্ঠের মিষ্টি হাসিও ভেসে আসছে।

অতি সন্তর্পণে জীপটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার জীপের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে নেয় অভিমন্যু। মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। তারপর তারা এসে দাঁড়ায় বাড়িটার একেবারে পেছন দিকে।

একতলার ঘরগুলো অন্ধকার। একটা মৃদু সবুজ আলো জ্বলছিল কেবল দোতলার একটা ঘরে।

পাকা ওস্তাদের হাতে অভিমন্যু একটা নাইলনের দড়ির সিঁড়ি ছুঁড়ে দেয় দোতলার বারান্দায়। ঠক্‌ করে একটা শব্দ হয়, লোহার হুকটা আট্‌কে যায় রেলিংয়ের সঙ্গে। তারপর সোমনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে অভিমন্যু ফিস্‌ ফিস্‌ করে কিছু বলতেই চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সোমনাথ ধীরে ধীরে উঠে যায় ওপরে। আর চোখ-কান খোলা রেখে নীচে পাহারায় থাকে অভিমন্যু।

গভীর ঘুমে অচেতন কাজল। ঘরের মৃদু সবুজ আলোয় সোমনাথের মনে হচ্ছিল যেন কাজলের সুন্দর মুখখানা এই এক বছরেই শুকিয়ে গেছে অনেকটা। সোমনাথ খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর এক

সময় দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু টোকা দেয় বন্ধ দরজার ওপর।

একবার—দু'বার—তিনবার। মুখে অস্ফুট একটা শব্দ করে পাশ ফিরে শোয় কাজল।

সোমনাথ এবার সরে আসে জানালার কাছে। তারপর গরাদের ওপর মুখ রেখে চাপাকণ্ঠে ডাকে—কাজল!

ঘুম ভেঙে যায় কাজলের। বিছানার ওপর উঠে বসে চোখ রগড়ে জানালার দিকে তাকিয়েই ভয়ে-বিস্ময়ে একেবারে বোবা হয়ে যায় সে। একি স্বপ্ন না সত্যি? এও কী সম্ভব? কে ঐ পুরুষ?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালঙ্কের ওপরই নিশ্চল হয়ে বসে থাকে কাজল। ভয় সে পেয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সে তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ভয়ে নয়, বিস্ময়ে। নইলে এতক্ষণে হয়ত সে চিৎকার করেই উঠ্‌ত।

চাপাকণ্ঠে সোমনাথ আবার বলে ওঠে, দরজা খোল, কাজল। আমি সোমনাথ।

অচঞ্চল প্রতিমার মুখে এতক্ষণে যেন ফুটে ওঠে চঞ্চলতার চিহ্ন। ত্রস্তপায়ে পালঙ্ক থেকে নেমে আসে কাজল। এতক্ষণে সে চিনতে পেরেছে সেই মানুষটিকে যার চিন্তাই এই একবছর ধরে সে করে এসেছে শয়নে-স্বপনে। অসম্ভব জেনেও যার কথা চিন্তা না করে একমুহূর্ত স্থির থাকতে পারে নি। সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। সোমনাথ এসেছে তাকে নিয়ে যেতে।

সোমনাথের ইঙ্গিতে সাবধানে দরজা খুলে দেয় কাজল। দীর্ঘ একবছর পর আবার মিলিত হয় একজোড়া নারী-পুরুষ। কঠিন পাশে বেঁধে রাখে একে অপরকে। বিপদের ভয় তুচ্ছ করে একে পান করতে থাকে অন্যের অধরসুধা।

একসময় সোমনাথ ফিস্ ফিস্ করে বললে, এখন কোন প্রশ্ন কর না। নীচে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে আমার বন্ধু, যার

ঐকান্তিক চেষ্টায় আমরা এই নিষিদ্ধ রাজ্যে এসে পৌঁছতে পেরেছি। এবার চল।

একমুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে কাজল। একবার ফিরে তাকায় ঘরের দিকে। তারপর দ্বিধাহীন কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করে, চল।

সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে নীচে নেমে আসে কাজল। আবছা অন্ধকারে একবার অভিমন্যুর মুখের পানে তাকায় সে। সজল চোখে ভেসে ওঠে কৃতজ্ঞতা।

তারপর নামতে থাকে সোমনাথ। প্রায় নেমে এসেছে সে। আর মাত্র সামান্য একটু বাকি। অকস্মাৎ হুক্‌টা কেমন করে খুলে যেতেই সশব্দে হুম্‌ড়ি খেয়ে নীচে পড়ে যায় সোমনাথ।

তেমন কোন আঘাত লাগে নি সোমনাথের। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়ে গেল তাদের সেই মুহূর্তে। অকস্মাৎ একসঙ্গে 'কে—কে' বলে নারীকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সেই পুলিশ কর্মচারীর দল। জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে তাবা ছুটে আসতে থাকে তাদের দিকে।

পরিকল্পনা আগেই স্থির করে রেখেছিল অভিমন্যু। ভেবেছিল, অন্ধকারে অতর্কিতে পুলিশ জীপ নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু এমনি একটা ঘটনার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। একমুহূর্ত বিহ্বলদৃষ্টিতে পুলিশের ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেই নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলে সে। চাপাকণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, শীগ্‌গির ঐ জীপে গিয়ে উঠে পড়ুন। ধরা পড়ে গেছি আমরা—

মহিলা পুলিশেরা যখন সেই নাইলনের দড়ির সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়, ঠিক তখনই একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তাদের চোখের সামনেই চলতে আরম্ভ করে পুলিশ জীপটা। হৈ-চৈ করে ওঠে তারা। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটা প্রচণ্ড বেগে তাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী পালিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল কারা? আবছা অন্ধকারে তাদের ঠিক্ পুরুষ বলে চিন্‌তে পারে নি কেউ।

কিন্তু লোক দু'টোর পোশাক-পরিচ্ছদ্ কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। তা'হলে সম্ভবতঃ দু'জন গুণ্ডাশ্রেণীর স্ত্রীলোক বেল-বটমের বদলে চাপা প্যান্ট ও গায়ে পুরুষের হাওয়াই সার্ট চাপিয়ে বন্দিনীকে মুক্ত করে নিয়ে পালিয়েছে। এদেশে সত্যিকারের কোন পুরুষের আবির্ভাব ছিল তাদের কল্পনারও অতীত।

চমৎকার পুলিশী ব্যবস্থা। দু'মিনিটের মধ্যেই পোর্টেবল্ বেতার-যন্ত্র মারফৎ খবর চলে যায় সদর দপ্তরে। আর, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ বোঝাই তিনখানা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে স্বয়ং মহিলা পুলিশ কমিশনার—ডোরোথি।

ডোরোথি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। দু'খানা গাড়িকে দু'দিকে পাঠিয়ে নিজে চলে যায় সেই শহরতলীর দিকে। তার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী কাজল সহরের কোথাও আত্মগোপন করে থাকতে সাহসী হবে না। তার একমাত্র আশ্রয়স্থল সমুদ্র-পাড়ের সেই জঙ্গল। তখনও সে জানতে পারে নি কাজলের সঙ্গী দু'জন কোন স্ত্রীলোক নয়—পুরুষ।

অনুমান সত্যে পরিণত হল ডোরোথির। ঝড়ের বেগে ছুটে চল্‌ছে পুলিশের গাড়ি। রাস্তাঘাট চিনে যেতে হচ্ছিল বলে তেমন জোরে জীপ চালাতে পারছিল না অভিমন্যু। তাই খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল তারা। পুলিশ কমিশনার ডোরোথির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল সামনের জীপটা।

ততক্ষণে অভিমন্যুও টের পেয়েছিল পেছনের গাড়িটার অস্তিত্ব। ব্যাক্-সীটে বসেছিল সোমনাথ ও কাজল। সামনে স্টীয়ারিং হাতে অভিমন্যু।

পেছনে ছুটে আসা গাড়িটার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উত্তেজিত কণ্ঠে সোমনাথ বলে ওঠে, বোধহয় কেউ পিছু নিয়েছে আমাদের।

সামনের দিকে নজর রেখে জবাব দেয় অভিমন্যু, হ্যাঁ, খুব সম্ভব পুলিশের গাড়ি।

উত্তেজনায় অবসন্ন কাজল এতক্ষণ চোখ বুজে স্থির হয়ে বসেছিল। গভীর রাতের সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ছায়াছবির মত ভেসে যাচ্ছিল তার চোখের সামনে। এতক্ষণে অভিমন্যুর কথায় চোখ মেলে তাকায় সে। শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, তা'হলে উপায় ?

কেউ কোন জবাব দেয় না কাজলের প্রশ্নের। দ্রুত চিন্তা করতে থাকে অভিমন্যু। একবার পুলিশ গাড়িটার দূরত্ব দেখে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আর কোন উপায় নেই। ধরা পড়তেই হবে আমাদের। তবে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সামনের দিকে আবার তাকায় অভিমন্যু। সেই জঙ্গলের প্রায় কাছে এসে পড়েছে তারা। সামনের ঐ বাঁকটা ঘুরলেই জঙ্গল। রাস্তাটা তাবপর সমান্তরালভাবে জঙ্গলের পাশে পাশে চলে গেছে।

অভিমন্যু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, জীপ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েও কোন লাভ হবে না। এখন ওরা নিশ্চয় দলে ভারী। তা'ছাড়া ওদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও নিশ্চয়ই আছে। কাজেই এবার ওদের চোখে ধূলো দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

একটু থেমে সোমনাথকে সম্বোধন করে অভিমন্যু আবার বললে, ঐ বাঁকটা ঘুবেই আমি গাড়ি থামাবো, আর আপনারা নেমে গিয়ে ঢুকে পড়বেন জঙ্গলের মধ্যে। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারেন সোজা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে লঞ্চ নিয়ে পালিয়ে যাবেন। আমি ততক্ষণে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পুলিশকে ব্যস্ত রাখবো।

অভিমন্যু থামতেই সোমনাথ বলে উঠে, তা কী করে হয় ? আপনাকে একা বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে—

সোমনাথের কথা শেষ হবার আগেই ভেসে ওঠে অভিমন্যুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ভুলে যাবেন না যে এখন তর্কের সময় নয়। বোকার মত সবাই মিলে ধরা পড়ার চাইতে এই ব্যবস্থা অনেক ভাল। মনে রাখবেন আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছেন। তাঁর নিরাপত্তার ভারও আমাদের ওপর।

আর কোন কথা বলে না সোমনাথ।

বাঁকের ওপাশে জীপটা থামতেই সোমনাথ ও কাজল নেমে পড়ে।

কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে কাজল কেবল একবার তাকায় অভিমন্যুর মুখের দিকে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সোমনাথ কিছু বলতে যায় অভিমন্যুকে। কিন্তু তাড়া দিয়ে ওঠে অভিমন্যু, একমুহূর্ত দেরি করবেন না আর। পেছনের গাড়িটা এসে পড়ল বলে। বলতে বলতে এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ্ দেয় অভিমন্যু। গর্জন করে ওঠে জীপটা। হাত নেড়ে অভিমন্যুকে বিদায় জানিয়ে ত্রস্তপায়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে সোমনাথ ও কাজল।

আরও প্রায় আধঘণ্টা পুলিশকে পথে পথে ঘুরিয়ে হয়বানি করে অভিমন্যু। অবশেষে সামনের রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ায় উল্টো দিক থেকে আসা আর একটা পুলিশ গাড়ি। সামনে-পেছনে দু'দিকেই পুলিশ। অগত্যা ধরা দিতে বাধ্য হয় সে।

স্টিয়ারিংয়ের ওপর থেকে হাত সরিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে সীটের ওপর বসে থাকে অভিমন্যু। সামান্য একটু ভুলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। আর বোধহয় দেখা হলো না সমাপ্তিকার সঙ্গে।

ডোরোথির নির্দেশে পুলিশ বাহিনী ঘিরে ধরে অভিমন্যুর জীপটাকে।

পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র মহিলারা তো বটেই, এমনকি স্বয়ং পুলিশ কমিশনার ডোরোথি পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে। একী অবিশ্বাস্য ব্যাপার! একী অস্বাভাবিক কাণ্ড! এই নিষিদ্ধ প্রমীলা রাজ্যে একজন জলজ্যান্ত পুরুষ!

পুলিশ বাহিনীর মহিলাদের মধ্যে অনেকের চোখের পাতাই যেন পড়তে চায় না। তাদের মধ্যে অনেকেই জীবনে এই প্রথম চাক্ষুষ দেখতে পেল একজন পুরুষকে।

ডোরোথির প্রশ্নের জবাবে একটি কথাও বলে না অভিমন্যু, এমনকি

নিজের নামটিও নয়। অবশেষে পুলিশবেষ্টিত অভিমন্যুকে সাবধানে নিয়ে আসা হল পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টারে।

পুলিশ কমিশনার ডোরোথি ভেবেছিল এমন একটা সাংঘাতিক খবর সে চাপা দিয়ে রাখবে, কিন্তু হেড্‌কোয়ার্টারে এসে দেখে দারুণ হৈ-চৈ সেখানে। নাগরিকেরা কিছু টের না পেলেও মহিলা সাংবাদিকেরা কিন্তু ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ডোরোথির মনে হয়, এই সাংবাদিক গোষ্ঠীরা যেন কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের, অধিকারী। তাই পৃথিবীর সব দেশেই এরা আগে থেকে ঠিক খবরটি পেয়ে যায়।

গাড়ি থেকে নামার সুযোগ পেল না অভিমন্যু। তার আগেই মহিলা সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরে তাকে। প্রেস ফটোগ্রাফার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দে ফটো তুলতে থাকে তার।

ভয় পায় পুলিশ কমিশনার ডোরোথি। পরের দিনের পত্র-পত্রিকায় যদি এই মানুষটার ছবি ছাপা হয় তা'হলে তার চাকরি থাকবে না কিছুতেই। পুরুষের ছবি যে এদেশে নিষিদ্ধ।

কিন্তু ছবি তো তোলা হয়ে গেছে। এখন তবে উপায় ?

ডোরোথির নির্দেশে এবার সাংবাদিক ফটোগ্রাফারদের ওপর শুরু হয় পুলিশী অ্যাকশান্। তাদের হাতের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে থাকে পুলিশ কর্মীরা। বাধা দিতে গিয়ে নির্যাতিত হয় কেউ কেউ।

নষ্ট করে ফেলা হলো ক্যামেরার ফিল্মগুলো। পরের দিনের খবরের কাগজে একজন পুরুষের ছবি ছাপা হবার আর কোন সম্ভাবনা রইলো না।

এই গণ্ডগোলের মধ্যেও অভিমন্যু কিন্তু স্থির অচঞ্চল। নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কেবল একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার ওষ্ঠপ্রান্তে—এতক্ষণে নিশ্চয় সোমনাথ কাজলকে নিয়ে ভেসে পড়েছে সমুদ্রে।

সত্যিই তাই। অন্ধকার সমুদ্রের ঘনকৃষ্ণ জলরাশি কেটে তর তর

করে এগিয়ে চলছে মোটর লঞ্চখানা। দু'জন আরোহী নিয়েই লঞ্চটি এসেছিল এই নিষিদ্ধ দ্বীপে। আবার দু'জন আরোহী নিয়েই ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু আসল লোকটিই নেই। সে তখন পড়ে রয়েছে অনেক পেছনে, সম্পূর্ণ একা।

অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে কাজল। তার কল্পনাতীত আনন্দ অনেকটা ম্লান হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে। মনে মনে সে ভাবতে থাকে এতক্ষণে হয়তো ধরা পড়েছে অভিমন্যু। হয়তো দারুণ অপমান করা হচ্ছে তাকে। নিজের বন্দীত্ব দিয়ে যে তার বন্দীত্ব ঘুচিয়েছে, সেই মহাপ্রাণ মানুষটি এখন কেমন আছে কে জানে ?

একসময় মৃদু কণ্ঠে সোমনাথ প্রশ্ন করে কাজলকে, আচ্ছা, তোমাদের দেশের আইনে অভিমন্যুর কি দণ্ড হতে পারে ?

জবাব দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলে কাজল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, মৃত্যুদণ্ড। আমাদের জন্যে একজন মানুষ নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চলেছে।

একহাতে লঞ্চের ষ্টীয়ারিং হুইল্‌টা চেপে ধরে অন্য হাতে পকেট হাতড়ে রুমালের খোঁজ করতে থাকে সোমনাথ। ঝাপ্‌সা চোখে বেশি দূরে দৃষ্টি যায় না তার।

॥ এগার ॥

পুলিশী এ্যাক্‌শানের পরেও যে সব নাছোড়বান্দা সাংবাদিকেরা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের ভিড়ের মধ্য থেকে অতিকষ্টে অভিমন্যুকে বের করে নিয়ে এসে বসানো হলো খোদ পুলিশ কমিশনার ডোরোথির ঘরে।

বছর চল্লিশের মত বয়স ডোরোথির। দেহের বাঁধুনিটি এখনও বেশ শক্ত। ভালো বাংলা বলতে পারে। না বলেও বা উপায় কি ? রাজ্যের সরকারী ভাষা যে বাংলা।

শেষ রাতের পরিশ্রমে ক্লান্ত ডোরোথি নিজের আসনে বসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। যাক্, মন্দের ভালো এটা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী কাজলের এমনভাবে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে কৈফিয়ত তাকে দিতেই হবে। তবে তার পরিবর্তে এই মানুষটিকে পাকড়াও করতে পেরেছে বলে কর্তৃপক্ষ হয়তো খানিকটা শান্ত হবে।

এতক্ষণে ডোরোথি অভিমন্যুর দিকে নজর দেওয়ার সময় পায়। যুবকটির চেহারা বাস্তবিকই সুন্দর। গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার কামানো সত্ত্বেও ফর্সা চামড়ার ওপর দাড়ি-গোঁফের কালো রেখা স্পষ্ট। এতে যেন ওর মুখের সৌন্দর্য আরও বেড়ে উঠেছে। টানা চোখদু'টোয় যেন স্বপ্নের আবেশ। একমাথা কুঞ্চিত চুল উস্কো-খুস্কো। জামার ওপরের বোতামটা খোলা। সেই ফাঁকে প্রশস্ত বুকের কালো চুলের অংশ বেরিয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে নারীর চেহারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক পুরুষালী অবয়ব।

অভিমন্যুর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না পুলিশ-কমিশনার ডোরোথি। কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে। তা'ছাড়া এই মানুষটা একজন ক্রিমিন্যাল—অপরাধী। এর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার দরকার কি? জিজ্ঞাসাবাদ করে ওর কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব খবর জেনে নিতে হবে—এই পর্যন্ত। তারপর ওকে আদালতে চালান করতে হবে বিচারের জন্যে।

—এক গ্লাশ জল খাওয়াতে পারেন? এই প্রথম এদেশের একজন মহিলার সঙ্গে কথা বললো অভিমন্যু।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় ডোরোথি, নিশ্চয়। ইচ্ছে করলে কিন্তু চা-ও খেতে পারেন।

—আজ্ঞে, এক গ্লাশ জলই আনিয়ে দিন। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। অভিমন্যু বললে।

ডোরোথির নির্দেশে একজন আর্দালী কনস্টেবল একটা সুদৃশ্য গ্লাশে একগ্লাশ জল এনে দেয় অভিমন্যুকে।

ঢক ঢক করে সবটুকু জল পান করে গ্লাশটি ফিরিয়ে দেয় অভিমন্যু।

ডোরোথি আবার বললে, চা আনাবো এবার?

—আনাতে পারেন। তবে শুধু চা, সঙ্গে আর কিছু নয়। এই সময় চায়ের সঙ্গে অন্যকিছু খাই না আমি।

দু'কাপ চা-ই এলো। একটা কাপ অভিমন্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে অন্য কাপটা ডোরোথি টেনে নেয় নিজের জন্যে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ডোরোথি অভিমন্যুকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যেতেই হঠাৎ সারি সারি সুদৃশ্য টেলিফোনের মধ্যে একটা বিচিত্র শব্দ করে বেজে ওঠে।

হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে বিরক্ত ভঙ্গিতে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডোরোথি বলে ওঠে—হ্যাল্লো।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে একজন ডেপুটি কমিশনারের কণ্ঠস্বর, ম্যাডাম্, গোটা জঙ্গলটা আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু সেই মেয়েটার কোন খোঁজ পাই নি।

বলতে থাকে ডোরোথি, আমি জানতাম, খোঁজ পাবেন না। মেয়েটা সম্ভবতঃ পালাতে সক্ষম হয়েছে অন্য লোকটার সঙ্গে।

—ইয়েস ম্যাডাম, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—কোন্ পথে পালিয়েছে বুঝতে পেরেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সমুদ্রপথে কোন লঞ্চে করেই বোধহয় পালিয়েছে। সমুদ্রের পাড়ে বালির ওপর নোঙরের দাগ ও পায়ের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছি।

—ওরা বোধহয় ঐ লঞ্চে করেই এসেছিল।

—আমারও তাই ধারণা।

—তবে অদ্ভুত সাহস বলতে হবে। এই গভীর সমুদ্রে একখানা ছোট লঞ্চ ভরসা করে—

—ইয়েস ম্যাডাম, সাহস তো বটেই। নইলে এই নিষিদ্ধ রাজ্যে ঢুকতে ওদের সাহস হয়? ওদের বরাত ভালো যে উপকূল রক্ষী

বাহিনীর নজর এড়াতে পেরেছিল ওরা। নইলে তো লঞ্চশুদ্ধ সমুদ্রের জলেই ডুবে মরতো।

—কিন্তু উপকূল রক্ষী বাহিনীর নজর এড়ালো কেমন করে?

—সেটাই আশ্চর্য ম্যাডাম, এরকম তো হবার নয়। আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারা গেলেও ওদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া তো ভয়ানক কঠিন।

—বোধহয় নেশার ঘোরে বুঁদ হয়েছিল তারা।

—হয়তো তাই, ম্যাডাম্। ওরা পাহাড়ী মেয়েছেলে। নেশা করতে ওরা অভ্যস্ত।

—ওদের নামে আমি রিপোর্ট পাঠাচ্ছি কর্তৃপক্ষের কাছে। ঐ সেক্টরে যাদের ডিউটি ছিল তাদের চাকরি এবার খতম্ হবে।

—তাই হওয়া উচিত, ম্যাডাম। দেশরক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর তারা যদি এমন অসতর্ক হয়—

—চাকরি যাবে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সেইসব কন্স্টেবলদেরও যারা নাকি ঐ মেয়েটার বাড়িতে রাতে পাহারায় ছিল। তা'ছাড়া, আমাদের সুপারভাইজিং স্টাফদের মধ্যেও কেউ কেউ এজন্যে দায়ী হবে যাদের ওপর ওদের ডিউটি চেক্ করার দায়িত্ব ছিল।

এবার কিন্তু সেই ডেপুটি কমিশনার আর কোন কথা বলে না। কাজলের বাড়ি পাহারার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল এই ডেপুটির ওপর।

—অল রাইট্, বলতে থাকে ডোরোথি, আপনি ঐ জঙ্গলে পাহারার ব্যবস্থা করে সহরতলী এলাকাটা ভালকরে খোঁজ করুন। বলা তো যায় না, সেই লোকটা মেয়েটাকে নিয়ে হয়তো এখনও এই দেশের কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

—তাই হবে, ম্যাডাম।

ডোরোথি রিসিভারটা নামিয়ে রাখে। তারপর চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, আমার ডেপুটির সঙ্গে কথা বললাম। শুনলেন তো আমাদের কথাবার্তা?

জবাবে অভিমন্যু শান্ত কণ্ঠে বললে, আপনার কথা শুনেছি বৈকি, তবে আপনার ডেপুটির কথা শুনতে পাই নি।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা' ঠিক্। আপনাদের বিষয় নিয়েই আলোচনা হলো। গোটা সহর ও সহরতলী এলাকা তন্ন তন্ন করে খোঁজার ব্যবস্থা করেছি আমরা।

—বেশ তো, ভালই করেছেন। মৃদু হেসে জবাব দেয় অভিমন্যু।

অভিমন্যুর হাসিমুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ডোরোথি তার মনের কথা আন্দাজ করতে চেষ্টা করে। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বললে, হাসছেন যে আপনি?

অভিমন্যু তেমনি মৃদু হাসিমুখে বললে, হাসছি আপনাদের অবস্থা দেখে। আপনাদের এই প্রমীলা রাজ্য চষে ফেললেও আপনারা সেই মেয়েটি ও ছেলেটাকে আর খুঁজে পাবেন না।

—কেন, তারা কি সত্যিই পালিয়েছে এদেশ ছেড়ে?

অভিমন্যু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—কেমন করে?

—আপনারা যা অনুমান করেছেন তেমনি করেই।

—ঐ লঞ্চে চেপেই বুঝি আপনারা এদেশে এসেছিলেন?

অভিমন্যু আবার মাথা নাড়ে।

—আপনাদের উদ্দেশ্য কি ছিল কেবল ঐ মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে পালানো?

—একটা উদ্দেশ্য তাই বটে। তবে চুরি করা নয়, তাকে উদ্ধার করা।

—আর কি উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে এসেছেন, বলবেন কি?

—মাপ করবেন, বলতে পারবো না।

—এদেশের কোন রকম ক্ষতি করা নিশ্চয়ই?

—না, এদেশের কোন ক্ষতি নয়।

—কাজল মেয়েটাকে নিয়ে যে পালিয়েছে সে বোধহয় আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ, বন্ধুই বলতে পারেন।

—তার নামটা বলবেন কি?

—মাপ করবেন, বলতে পারবো না।

—আপনার নিজের নাম-ঠিকানা বলবেন কি?

—আজ্ঞে না, তাও বলবো না।

—না বলার কারণটা জানাবেন কি?

একটু সময় চুপ্ করে থেকে অভিমন্যু জবাব দেয়, আমরা মেন-ল্যাণ্ডের অধিবাসী। আমাদের নাম ঠিকানা নিয়ে যাতে ভবিষ্যতে আপনারা আমাদের দেশের সরকারকে বিব্রত করতে না পারেন সেই জন্যেই নাম-ঠিকানা বলছি না।

কথা বলতে বলতে ডোরোথি বাংলা সর্ট-হ্যাণ্ডে নোট্ নিচ্ছিল। হাতের পেন্সিলটা নামিয়ে রেখে সে এবার বললে, আপনি একটু আগে বললেন যে সেই কাজল মেয়েটিকে আপনারা চুরি করেন নি, উদ্ধার করেছেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন অপরাধীকে নিয়ে এমনি ভাবে পালিয়ে যাওয়াকে কি উদ্ধার করা বলে?

মাথা নেড়ে বলতে থাকে অভিমন্যু, হ্যাঁ, তাই বলে। কারণ আমাদের মতে সে কোন অপরাধ করেনি।

—অপরাধ করে নি? দেশের আইন ভঙ্গ করাকে অপরাধ বলে না?

—হ্যাঁ বলে। তবে যে আইন মানুষের মঙ্গল করে না, সেই আইন ভঙ্গ করলে কোন অপরাধ হয় না। আমাদের দেশে মহাত্মা-গান্ধী নামে একজন মস্তবড় রাজনৈতিক নেতা এককালে আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি নিজে লবন-আইন নামে একটি আইন ভঙ্গ করেছিলেন। আমরা তাঁর দেশবাসীরা আজও মনে করি তিনি কোন অপরাধ করেন নি।

ডোরোথি আবার একটু সময় চুপ্ করে থাকে। তারপর আবার বললে, আপনারা অর্থাৎ পুরুষ-কর্তৃত্বের দেশের মানুষেরা যাই বলুন না

কেন, আমরা এই প্রমীলা রাজ্যের মেয়েরা বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশের আইন তৈরি হয়েছে দেশের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্যেই।

মৃদু হেসে জবাব দেয় অভিমন্যু, একে বলে অন্ধ বিশ্বাস।

—অন্ধ বিশ্বাস কেন?

—কারণ ঈশ্বরের এটা অভিপ্রেত নয়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে প্রভৃতি বিষয়গুলোকে আমরা ঈশ্বরের দান বলেই মনে করি।

ডোরোথ এবার মৃদু হেসে বললে, তা'হলে আপনাদের দেশে যারা চিরকুমার কিম্বা চিরকুমারী থাকে তারাও ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী না চলার অপরাধে অপরাধী?

জবাব দেয় অভিমন্যু, না, তা' নয়। তার পেছনে কোন ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। পুরুষ কিম্বা নারীর প্রতি বিদ্বেষ বশে সাধারণতঃ কেউ চিরকুমারী কিম্বা চিরকুমার থাকে না। কেউ যদি তা' থাকে তবে সে নিঃসন্দেহে অপরাধী।

আলোচনায় এখানেই ইতি টেনে ডোরোথি গা-ঝাড়া দিয়ে বলে ওঠে, যাক্ গে, ওসব কথা। আপনি কি কোন বিবৃতি দিতে চান?

—আজ্ঞে, না।

—আদালতে আপনার বিচার হবে। আপনি কি সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান?

—না।

—সেকি? মামলা লড়বেন না আপনি?

—আজ্ঞে না, আপনাদের দেশের আইনে আমি অপরাধ করেছি। আর, আমার মতে আমি কোন অপরাধ করি নি। এদেশের আইন মতেই যখন আমার বিচার হবে তখন তো আমি দোষী সাব্যস্ত হবোই। কাজেই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই না আমি। এতে কোন লাভ হবে না।

ডোরোথি আবার বললে, আদালতের হুকুম নিয়ে পুলিশ তদন্ত

চলাকালে আপনাকে আমরা পুলিশ-হাজতে রাখবো। তারপর পাঠিয়ে দেব জেলে। বিচার চলার সময় প্রতিদিন জেল থেকেই আপনাকে আদালতে হাজির কবা হবে।

—বেশ তো, আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করবেন। জবাব দেয় অভিমন্যু।

কোনদেশের আর্থিক কাঠামো ভালো হলেই যে সে দেশে অপরাধ কম ঘটবে তেমন কোন অর্থ নেই। তাই যদি হ'তো তা'হলে, ইউরোপে অপরাধ কম ঘটতো। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা' নয়।

এই প্রমীলা রাজ্যেও তেমনি অপরাধীর সংখ্যা মোটেই কম নয়। চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয় এদেশে। তাই থানার পুলিশ-হাজতগুলো প্রায়ই বিভিন্ন বয়সের অপরাধীতে সর্বদাই পূর্ণ থাকে। তা'ছাড়া, এই পুরুষহীন সমাজে কোন থানাতেই পুরুষের জন্যে কোন হাজতের ব্যবস্থা নেই।

কাজেই মুশকিল হলো অভিমন্যুকে হাজতে রাখা নিয়ে। এমন একজন দুর্দ্ধর্ষ অপরাধীকে হাজতের বাইরে রাখাও চলে না। অবশেষে পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টারের একটি ঘরকেই অস্থায়ী হাজতঘর হিসেবে ব্যবহার করার হুকুম হলো। রাইফেলধারী স্পেশাল গার্ডের ব্যবস্থা হলো তার জন্যে।

এদিকে গোটা রাজ্যজুড়ে দারুণ হৈ-চৈ। পরের দিনের সংবাদপত্রে খবরটা ফলাও করে ছাপা হতেই চারিদিকে হুলুস্থুলু কাণ্ড শুরু হলো। রাস্তাঘাটে, পথে-প্রান্তরে কেবল ওই একই আলোচনা—একজন পুরুষমানুষ নাকি এদেশে ধরা পড়েছে।

পুরুষ কর্তৃক নিগৃহীতা হয়ে যারা এদেশে পালিয়ে এসে ভয়ানক পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে তারা এই খবরে চিন্তিত হয়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা—এদেশের মাটিতেও ঐ আপদগুলো এসে আবার জুটেছে। যারা ততটা পুরুষ বিদ্বেষী নয় তারা বিস্মিত—লোকটা কেন এসেছে এদেশে? কি ওর উদ্দেশ্য? কিন্তু যারা

কোনদিন পুরুষ দেখেনি কিম্বা ছেলেবেলায় দেখলেও মনে নেই, তারাই সবচাইতে বেশি কৌতূহলী। ওদের মধ্যে যাদের বয়স একটু কম তারা দলে দলে গ্রাম গঞ্জ সহর থেকে এসে ভিড় করেছে রাজধানীতে লোকটিকে দেখবে বলে। একটা অদ্ভুত জীবকে দেখতে মানুষ যেমন ছুটে যায়, তেমনি এরা রাজধানীতে ছুটে এসেছে একবাব মাত্র অভিমন্যুকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে।

ব্যাপারটা বড়ই বিসদৃশ লাগে অভিমন্যুর। কোথাও একটু শান্তিতে থাকার উপায় নেই। চারিদিকেই কেবল দর্শনার্থীর মেলা। সে যেন রাতারাতি হয়ে উঠেছে একজন বিশ্ববিখ্যাত নেতা কিম্বা চিড়িয়াখানার একটা বিচিত্র জীব।

পুলিশ-হাজতেও একটু শান্তিতে থাকতে পারে না অভিমন্যু। নারী পুলিশ-প্রহরীদের নিববিচ্ছিন্ন দৃষ্টির সামনে সঙ্কোচবোধ করে সে। জেলের মধ্যেও ঠিক্ একই অবস্থা। মেয়ে জেল-ওয়ার্ডেনেরা পাহারা দেবার নাম করে সর্বদাই তাকে চোখে চোখে রাখে, তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি নজর করে দেখে।

মামলা চলছে আদালতে। প্রতিদিন খোলা পুলিশভ্যানে চেপে অভিমন্যু জেলখানা থেকে এসে হাজির হয় আদালতে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারপর্ব দেখে। এইটুকু পথেব দু'পাশে প্রতিদিনই কাতারে কাতারে শিশু, বৃদ্ধা, যুবতী, প্রৌঢ়া দাঁড়িয়ে থাকে কেবলমাত্র তাকে চোখের দেখা দেখবে বলে। তাদের মধ্যে কারুব দৃষ্টিতে কেবল কৌতূহল, কারুব বা বাৎসল্য রসের জোয়ার—আহারে, বাছা কেন মরতে এসেছে এদেশে! কোন যুবতীর চোখে হয়তো মদির কটাক্ষ যা নাকি এতদিন প্রয়োগ করার সুযোগই পায় নি সে। নারীর কটাক্ষ বাণে কোন নারীকে তো আর বিদ্ধ করা যায় না। আবার কারুর বা চোখে-মুখে স্পষ্ট কামনার চিহ্ন। একজন সত্যিকারের পুরুষকে দেখে তাদের সুপ্ত তাড়না মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

সহর ছাড়িয়ে সহরতলীর একেবারে শেষপ্রান্তে একটা পোড়ো বাড়ি। এককালে প্রচুর জাঁক-জমক ছিল এই বাড়িটার, কিন্তু আজ এটা পরিত্যক্ত। ভেঙ্গে পড়েছে দেয়ালের ইট, ঝুলে পড়েছে ছাদের কড়ি-বরগা। ভাঙ্গা দেয়ালের ফাটলে বট ও অশ্বথের চারা। রাতের অন্ধকারে নির্জন এই তল্লাটে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকে বাড়িটা। গ্রামবাসীরা ভুলেও এই বাড়িটার ত্রিসীমানায় আসে না। এটা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি। রাতে নাকি মাঝে মধ্যে আলো দেখা যায় এই বাড়ির কোন কক্ষে। মাঝে মাঝে নাকি সুরের ঝঙ্কারও ভেসে ওঠে।

এই ভুতুড়ে বাড়িটার এক নির্জন কক্ষে একদিন দুপুরে পাঁচটি যুবতী নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন। সতেরো থেকে চব্বিশের মধ্যেই বয়স তাদের। পরনে তাদের আধুনিক বেল-বটম্, গায়ে মেয়েদের সার্ট, মাথার চুল প্রত্যেকেরই রুক্ষ, একজনের কেবল বব্।

এই পাঁচটি যুবতী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও একই কর্মাবলম্বী, এদের মধ্যে মিলি ও পানু হিন্দু। বয়স ওদের আঠারো উনিশের মত। আনোয়ারা ও রাবেয়া মুসলমান। এই পাঁচজনের মধ্যে আনোয়ারার বয়সই সবচাইতে বেশি—তেইশ-চব্বিশ। আর সবচাইতে ছোট রাবেয়া—ওর বয়স সতেরোর বেশি নয়। বাকি মেয়েটির নাম জিনা। একুশ বছরের মেয়ে জিনা খৃষ্টধর্মাবলম্বী।

পুলিশের খাতায় এদের নামের পাশে 'ক্রিমিন্যাল' শব্দটি লেখা থাকলেও আসলে কিন্তু এরা সাধারণ ক্রিমিন্যাল নয়। বরঞ্চ বলা চলতে পারে রাজনৈতিক ক্রিমিন্যাল। দেশের আইন কানুনের ওপর একটুকু শ্রদ্ধা নেই এদের। অল্প বিস্তর শিক্ষিত এরা সবাই।

একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সদস্যা এরা। দু'একবার পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছে, কিন্তু প্রমাণ অভাবে সরকার বাধ্য হয়েছে এদের ছেড়ে দিতে।

কথা বলছিল সুশ্রী তন্বী মিলি। বেণী দুলিয়ে দলের সদস্যাদের

কাছে সে রাখছিল তার বক্তব্য। বলছিল, এই সরকারের এই বিদঘুটে আইন আমরা ভাঙবোই ভাঙবো। প্রচার অভিযান বাড়িয়ে তুলতে হবে আমাদের। দেশের মেয়েদের বোঝাতে হবে যে এমনিভাবে নিজেদের বঞ্চিত রাখা একেবারেই অর্থহীন। আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আনতে হবে আমাদের দেশকে। মানবিক অধিকারের প্রয়োগ চাই এদেশে। পৃথিবীর কোটি কোটি নারীর মত আমরাও চাই সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করতে। চাই একখানি-ঘর, চাই একজন পুরুষ সঙ্গী, চাই ঘর আলো করা শিশু। মানুষের এই অধিকার থেকে কোন দেশের কোন সরকারই তার অধিবাসীদের বঞ্চিত রাখতে পারে না।

মিলি থামতেই দলনেত্রী আনোয়ারা জিনার দিকে তাকায়। বব্‌ চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে জিনা একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নেয়। তারপর বলতে থাকে, মিলি আমাদের দলের যে আদর্শের কথা বললো তা' আমরা সবাই জানি। এই আদর্শ মত চলতেই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের এই আদর্শ আমরা প্রচার করবো কেমন করে? আমাদের দল নিষিদ্ধ। প্রকাশ্যে আমরা আমাদের মত প্রচার করতে পারি না। গ্রামে-গঞ্জে গোপনে দু'একটা মিটিং ডাকার যে চেষ্টা আমরা করি নি তা' নয়। কিন্তু তাতেও তেমন লোক হয় না। পুলিশের ভয়ে কেউ সাড়া দিতে চায় না আমাদের ডাকে। এখন প্রশ্ন হলো কোন্ পথে আমরা চালাবো আমাদের প্রচার কার্য?

জিনার কথা শেষ হতেই পান্নু বলতে থাকে, আমার মতে এমন ভাবে দলের কাজ আর চালানো যায় না। সহরে গ্রামে সর্বত্রই ঘুরে দেখেছি একটা অদ্ভুত কাণ্ড। অল্প বয়সী মেয়েরা অধিকাংশই আমাদের মতের সমর্থক; পুরুষ সঙ্গী চায় তারা। বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতবার স্বপ্ন দেখে। ধীরে ধীরে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যখন তারা বুঝতে পারে তাদের সেই স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন তখন সেই না-দেখা পুরুষ জাতটার ওপর তারা হয়ে ওঠে বিরক্ত। সেই বিরক্তি থেকেই

কালে কালে সৃষ্টি হয় বিদ্বেষ। অবশেষে তারা হয়ে ওঠে ভয়ানক পুরুষ-বিদ্বেষী।

পানু কথা শেষ করে থামে। এবার রাবেয়ার পালা। বেঁটে খাটো রাবেয়া একটু হালকা স্বভাবের মেয়ে। বয়সও যেমন অল্প কথা বলার ভঙ্গিটিও তার ছেলেমানুষী ধরনের। রাবেয়া বলতে থাকে, পানুদি ঠিকই বলেছে। শুধু কথায় এযুগে আর চিঁড়ে ভেজে না। দেশের মেয়েদের আর বুঝিয়ে কি হবে? তারা কি সবাই অবুঝ? আসলে হাঁতে-নাতে কাজ করতে হবে আমাদের। এদেশে পুরুষের আমদানী ঘটাতে হবে। তারা এসে বিয়ে করবে এদেশের মেয়েদের। পাতবে ঘর-সংসার। তাদের দেখাদেখি পুরুষের নামে যারা নাক সিঁটকায়, তারাও দলে ভিড়ে যাবে একদিন। অবশেষে দেশের সরকার বাধ্য হবে আইন-কানুন পাল্টাতে। জোর করে আইন ভঙ্গ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। মুখের বুলির দিন শেষ হয়ে গেছে।

—দলে দলে পুরুষ এদেশে আসতে যাবে কোন্ দুঃখে? তাদের দেশে কি মেয়ের অভাব নাকি? জিনা জিজ্ঞেস করে রাবেয়াকে।

রাবেয়ার বদলে জবাব দেয় পানু, পৃথিবীতে এখনও এমন দেশ আছে যেখানে মেয়ের সংখ্যা কম। সেদেশ থেকে আমদানী করতে হবে তাদের। এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক দেশের চাইতেই ভালো। সুখের জীবনের লোভে অনেকেই আসতে চাইবে।

মিলি এবার বলে ওঠে, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

—তার মানে? জিজ্ঞেস করে রাবেয়া।

—পুরুষের দল এদেশে আসতে চাইলেই তাদের আসতে দিচ্ছে কে? তাদের নিজেদের দেশের সরকার কি তাদের সেই অনুমতি দেবে? তা'ছাড়া এদেশের সরকার তাদের এই প্রমীলা রাজ্যে ঢুকতে দেবে কেন?

মিলির এই প্রশ্নের জবাব আর কেউ দিতে পারে না।

জিনা আবার বললে, তা'ছাড়া দলে দলে পুরুষ এসে এদেশে ঘর সংসার পেতে মেয়েদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে আমরা নিশ্চয়ই তা' চাই না।

—না—না, আমরা কেউ তা' চাই না। মিলি, পান্নু ও রাবেয়া বলে ওঠে একসঙ্গে।

দলনেত্রী আনোয়ারা এতক্ষণ কিছু মন্তব্য করে নি। সে কেবল এদের মধ্যে বয়সেই বড় নয়, দেখতেও সবচাইতে সুন্দরী। তার কথা বলার ভঙ্গিটিও দলনেত্রীর মতই।

স্থির শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে আনোয়ারা, একদিক থেকে বলতে গেলে রাবেয়া ঠিক কথাই বলেছে। আইন অমান্য করে লোকের মন থেকে এই বিদঘুটে আইনের প্রতি শ্রদ্ধার অবসান ঘটাতে হবে। কিন্তু মুশকিল হলো আমরা আইন অমান্য করবো কেমন করে? সরকারের আইনকে তোয়াক্কা না করে হাজার হাজার মেয়ে হয়তো ঘর-সংসার পাততে এগিয়ে আসবে। কিন্তু ঘর-সংসার পাতা হবে কি দিয়ে? পুরুষ না থাকলে তো তা' সম্ভব নয়। আবার পুরুষের আগমনের অর্থই হলো খাল কেটে কুমীর ডেকে নিয়ে আসা। ওদের রক্তের মধ্যে রয়েছে খবরদারী করার বীজ। সংসারের কর্ত্তা হয়ে বসতে চাইবে ওরা। কাজেই এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙ্গে। এদেশে পুরানো দিনের সেই ম্যাট্রিয়ারক্যাল সমাজের পত্তন করতে হবে যেখানে সংসারে মা'-ই হবে কর্ত্রী। বাপের স্থান হবে পেছনে। মায়ের পরিচয়েই হবে সংসারের পরিচয়।

আনোয়ারা থামতেই খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে রাবেয়া। বলতে থাকে সে, তুমি ঠিক কথাই বলেছ, আনোয়ারাদি। পুরুষ আমাদের চাই। ওদের না হলে ঘর-সংসার পাতার কোন অর্থ হয় না। সৃষ্টি হবে না ভবিষ্যৎ বংশধর। কাজেই ওদের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ওদের বেশি বাড়াবাড়ি করতে দেওয়া চলবে না। আমরাই শাসন করবো ওদের। ওরা আমাদের নয়।

এবার মিলি, পান্নু ও জিনাও সমর্থন করে আনোয়ারাকে। মিলি বললে, জনমত গঠন করতে হবে আমাদের। জনতার চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে সরকার। তারপরে সরকারী ব্যবস্থাপনায় দলে দলে পুরুষ আসবে এদেশে। সরকারী উৎসাহেই তারা আসবে। তারা এসে কিন্তু এদেশের মেয়েদের বিয়ে করবে না, এদেশের মেয়েরাই বিয়ে করবে তাদের। সংসারের কর্তৃত্ব থাকবে মেয়েদের হাতে। দেশের আইন কানুনও তেমনি ভাবেই তৈরি হবে।

আনোয়ারা আবার বললে, উপদেশের চাইতে দৃষ্টান্ত শ্রেষ্ঠ। আমার মতে মৌখিক উপদেশ না দিয়ে আমরা যদি দেশের মেয়েদের কাছে কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি তা'হলে তাতে ফল হবে অনেক বেশি।

—কেমন করে তুমি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাও? মিলি জিজ্ঞেস করে?

একটু সময় স্থির হয়ে থেকে জবাব দেয় আনোয়ারা, কয়েকদিন থেকেই একটা কথা আমার মাথায় ঘুরছে। তোরা তো শুনেছিস, একজন পুরুষ এদেশে ধরা পড়েছে। বিচার চলছে তার।

—তাকে দিয়েই বুঝি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাও? প্রশ্ন করে পান্নু।

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় আনোয়ারা, ঠিক তাই। যুবকটি যখন ধরাই পড়েছে, তখন বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। এমন একটি যুবকের জীবন মিছি মিছি নষ্ট হতে না দিয়ে যুবকটিকে যদি আমরা আমাদের কাজে লাগাই তা'হলে তা' একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে দেশের মেয়েদেব কাছে। উৎসাহিত হবে তারা।

কেউ কোন কথা বলে না। সবাই কেবল যে যার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টিকে বিচার করতে থাকে।

একসময় জিনা প্রশ্ন করে, তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাবে কেমন করে?

জবাব দেয় আনোয়ারা, জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে।

আবার সবাই চুপচাপ, সকলের মনেই এক প্রশ্ন—ছিনিয়ে তো নিয়ে আসা হলো। এবার কি হবে? কেমন করে ব্যবহার করা হবে তাকে? প্রকাশ্যে করা হবে, না গোপনে? প্রকাশ্যে হলে তো সরকার বাদ সাধবে।

উপস্থিত সকলের মনের এই প্রশ্নগুলোকে ভাষা দেয় রাবেয়া। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে সে বললে, ছিনিয়ে নিয়ে আসার পরে কে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবে?

জবাবটা যেন তৈরিই ছিল আনোয়ারার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দেয়, কেন, আমরা পাঁচজনে মিলেই ঘর বাঁধবো তার সঙ্গে।

—সেটা কেমন ব্যাপার দাঁড়াবে? মিলির মুখে অসন্তুষ্টির সুর।

জবাব দেয় রাবেয়া, এই অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই একজন করে যুবকের বিলাসিতা শোভা পায় না মিলিদি। আছে তো মাত্র একজন। এই একজনকেই আমাদের ভাগ করে নিতে হবে, যেমন নাকি তোমাদের মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব একটি মাত্র দ্রৌপদীকে ভাগ করে নিয়েছিলেন। আমরা তার বদলে পঞ্চ দ্রৌপদী একটি মাত্র পাণ্ডবকে ভাগ করে নেব। বলেই আবার খিল খিল করে রাবেয়া হেসে ওঠে।

পানু বলে উঠে, না, তাতে তেমন কিছু অসুবিধে হবে না। শোনা যায় পুরানো দিনে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে একজন পুরুষের নাকি শতাধিক স্ত্রী থাকতো।

—না, কথাটা তোর ঠিক্ হলো না পানু, বলতে থাকে জিনা, একজন স্বামীর শতাধিক স্ত্রী, আর শতাধিক স্ত্রীর একজন স্বামী—এই কথা দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। ঐ যুবকটিকে যদি আমরা সত্যিই ছিনিয়ে আনতে পারি তা'হলে ঐ যুবকটি আমাদের পাঁচজনকে বিয়ে করবে না, আমরা পাঁচজন ওকে বিয়ে করবো। আমাদের কর্তৃত্বের মধ্যেই থাকতে হবে ওকে।

কথাটা কেবলমাত্র চিন্তা করেই সর্বাঙ্গ আনন্দে শিউরে ওঠে এই পাঁচটি যুবতীর। রাবেয়া আর নিজেকে সামলাতে না পেরে আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, খুব মজা হবে আনোয়ারাদি।

আনোয়ারা কিন্তু গম্ভীর স্বরে ধমকে ওঠে রাবেয়াকে। বললে, ছেলেমানুষী করিস না, রাবেয়া। এটা ঐ যুবকটির প্রতি আমাদের কোনরকম মোহ নয়। জৈবিক আকাঙ্ক্ষায় অন্ধ হয়ে আমরা একাজে নামছি না। মনে রাখিস্, একটা আদর্শের পেছনে চলেছি আমরা। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। দেশের আইন অমান্য করে আমরা এই কাজে এগিয়ে যাবো।

আনোয়ারার ধমকে একটু চুপ্‌সে যায় রাবেয়া।

জিনা এবার প্রশ্ন করে, সরকারের দৃষ্টি থেকে আমরা ঐ যুবকটিকে রক্ষা করবো কেমন করে?

—ওকে আমরা লুকিয়ে রাখবো। কেউ টের পাবে না ওর অস্তিত্ব।

—কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যেই যেদিন ঐ যুবকটির অস্তিত্ব ফুটে উঠবে? যুবকটির সাহায্যে আমাদের বংশধরদের যেদিন আমরা বহন করে নিয়ে বেড়াবো সেদিন তো সবাই তা' টের পাবে।

—পাবেই তো। বলতে থাকে আনোয়ারা, আমরা তো গর্ব করেই সবাইকে তা' দেখাবো। এর মধ্যে তো লজ্জার কিছু থাকবে না। সে তো আমাদের বিবাহিত স্বামী।

—পুলিশ তখন আমাদের ওপর হামলা চালাবে। মিলি বলে ওঠে।

জবাব দেয় পান্নু, আদর্শের জন্যে পুলিশী হামলা তো সহ্য করতেই হবে। দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

অবশেষে দলনেত্রী আনোয়ারার কথামত চলতেই দলের বাকি চারজন সম্মত হয়। শেষ হয় তাদের সেদিনের মত আলোচনা।

॥ বারো ॥

প্রমীলা রাজ্যের প্রতিটি অধিবাসী যা অনুমান করেছিল শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে। মহিলা বিচারক অভিমন্যুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

তার বিরুদ্ধে পুলিশের দু'দফা অভিযোগ। প্রথমতঃ, অভিমন্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন অপরাধীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আর দ্বিতীয়তঃ, সে পুরুষ হয়ে এই নিষিদ্ধ প্রমীলা রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

দায়রা আদালতের এই রায় অবশ্যি দেশের হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ।

মহিলা বিচারক যখন তাঁর রায় পাঠ করছিলেন, অভিমন্যু তখন একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। যদিও সে অনুমান করেছিল যে বিচারে তাকে চরম দণ্ডই দেওয়া হবে, তবুও মনের মধ্যে তখনও একটু ক্ষীণ আশা ছিল তার—মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হতে পারে।

কিন্তু মহিলা বিচারকের মুখে নিজের মৃত্যুদণ্ডের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানা তার ম্লান হয়ে উঠলো। মাথা নোয়ালো আদালতে উপস্থিত মহিলা উকিল, ব্যারিস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীরা। এমন একটি সুন্দর সুপুরুষ যুবকের প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা যেন তারাও গ্রহণ করতে পারে নি খুশিমনে।

আদালতের বাইরে জনতার ভিড়। বিচারকের রায় শোনবার জন্যে তারা উদগ্রীব। আদালতে অভিমন্যুর বিচার ছিল ক্যামেরা-ট্রায়াল। জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে।

রায় পাঠ শেষ হলে বিচারক উঠে গেলেন নিজের চেম্বারে। সশস্ত্র-পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন মহিলা অফিসার ও কনস্টেবল আসামীর কাঠগড়া থেকে অভিমন্যুকে নিয়ে চললো বাইরে অপেক্ষমান পুলিশ-

ভ্যানের দিকে। তাকে এখন জেলে যেতে হবে। যে ক'দিন হাইকোর্ট থেকে তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার অনুমোদন না আসে, সেই ক'টা দিন জেলেই থাকতে হবে অভিমন্যুকে।

পুলিশ-ভ্যানের মধ্যে গম্ভীর মুখে বসেছিল অভিমন্যু। শোকে-দুঃখে সেই মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তার মনটা। এ দুঃখ কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের জন্যে নয়। যে কাজে সে নেমেছিল তা'তে যে কোন মুহূর্তে যে তার মৃত্যু হতে পারে একথা অজানা ছিল না তার। তার দুঃখের কারণ ছিল ভিন্ন। উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হলো না। সমাপ্তিকাকে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখবার জন্যে এই যে তার প্রচেষ্টা তা' সার্থক হলো না। তার আগেই তাকে চলে যেতে হচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে।

পুলিশ-ভ্যান এসে দাঁড়ায় জেল-গেটের সামনে। সেখানেও বৃদ্ধা, যুবতী ও প্রৌঢ়ার ভিড়। সকলের দৃষ্টিই খোলা পুলিশ-ভ্যানে উপবিষ্ট অভিমন্যুর দিকে।

জেল-গেটের বিশাল দরজা খুলে যায়। গাড়ি থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসে অভিমন্যু। তার ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে পুলিশ রক্ষী বাহিনী।

হঠাৎ একটা কর্ণবিদারী শব্দ। পরমুহূর্তেই আর একটা। তারপর আরও অনেকগুলো।

চারিদিকে হৈ-হুল্লোড়, চেঁচামেচি-চিৎকার। গন্ধকের ধোঁয়ায় জায়গাটা প্রায় অন্ধকার হয়ে উঠেছে। দু'হাত দূরের কোন বস্তুও দেখা যায় না। সশস্ত্র প্রহরীদের মধ্যে কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় মাটিতে। বোমার আঘাতে কাতর ধ্বনি জেগে উঠে কোন নারীকণ্ঠে। বুটের শব্দ তুলে পালায় কোন প্রহরী। তার গায়ে ধাক্কা লেগে দর্শনার্থী কোন মহিলা ছিটকে পড়ে কেঁদে-কঁকিয়ে উঠে। মুহূর্তের মধ্যেই একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড ঘটে যায় জেল-গেটের সামনে।

বোমা—বোমা—বোমা ছুঁড়ছে কেউ। কিন্তু কে ছুড়ছে, কে

ছুঁড়ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সেই মুহূর্তে যে যার নিজের জীবন রক্ষায় ব্যস্ত। অন্যের দিকে নজর দেবার সময় কোথায়?

জেলের গেটে প্রহরীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে দুষ্কৃতকারীরা। কিন্তু কি উদ্দেশ্য তাদের তা' সেই মুহূর্তে বোঝার মত মনের অবস্থা কারুরই ছিল না।

আহত না হলেও বোমার প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল অভিমন্যু। হাতে তার হাতকড়া। কাজেই সেই অবস্থায় উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেও সফল হচ্ছিল না সে।

হঠাৎ সেই ধোঁয়ার অন্ধকারের মধ্যে ক'য়েকখানা নারী-হস্ত এগিয়ে আসে তার দিকে। অভিমন্যু কিছু বুঝতে পারার আগেই তারা তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেয়। অভিমন্যু কিছু না বলে কেবল তাকায় তাদের দিকে। মনে তার হাজারো প্রশ্ন—কে এরা? কেন তাকে সাহায্য করতে এরা এগিয়ে এসেছে ?

হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন তার কানের কাছে মুখ এনে ত্রস্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, দেরি করবেন না—একটুও দেরি করবেন না। যদি বাঁচতে চান তো চলে আসুন আমাদের সঙ্গে—চলে আসুন—

চিন্তা করবার সময় নেই, ভাবনার অবসর নেই। বাঁচতে হবে তাকে, ফাঁসির দড়ির আওতা থেকে পালাতে হবে। যে করেই হোক্ নিজের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতেই হবে। একবার দু'চোখ ভরে দেখতে হবে প্রিয়তমাকে। তারপরে যা হয় হোক, ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে তখন আর আপত্তি করবে না অভিমন্যু।

ওদের মধ্যে একজন আবার তাড়া দেয় তাকে, ওকি, দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখনো? শিগ্গির চলে আসুন। এখনই জেলের পাগলা ঘন্টি বেজে উঠ্বে। গোটা জায়গাটাকে ঘিরে ফেলবে পুলিশ। তখন আর পালাবার সুযোগ পাবেন না। আপনার ভয় নেই। আপনি চলে আসুন আমাদের সঙ্গে। আমরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষিনী।

আর কোন দ্বিধা নয়। অভিমন্যু ছুটতে থাকে তার সেই

সাহায্যকারিনীদের পিছু পিছু। আর ঠিক্ সেই মুহূর্তেই জেলের পাগলাঘন্টি বেজে ওঠে ভয়ঙ্কর শব্দে।

জেল-গেট থেকে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরেই দাঁড়িয়েছিল একখানা কালো রংয়ের মোটর গাড়ি। দুষ্কৃতকারী মেয়েদের দলটি সেখানে এসেই থমকে দাঁড়ায়। একজন তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিতেই আর একজন অভিমন্যুকে একরকম ঠেলে দেয় তার মধ্যে। পরক্ষণেই একজন এসে বসে ড্রাইভারের আসনে, আর অন্যেরা এসে জায়গা নেয় অভিমন্যু ও ড্রাইভারের পাশে। চোখের নিমেষে একবাশ ধোঁয়া ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় গাড়িটা।

সহর ছাড়িয়ে সহরতলীর পথে দ্রুত ছুটে চলছে সেই কালো রংয়ের গাড়িখানা। উত্তেজনা শেষে গাড়ির আরোহীরা তখনও হাঁপাচ্ছে। কাজের সাফল্যে তাদের প্রত্যেকের মুখেই খুশির চিহ্ন।

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল অভিমন্যু। এবার সেই ঘোর একটু কাটতেই সে গাড়ির আরোহীদের দিকে ভাল করে তাকায়।

অভিমন্যুকে নিয়ে মোট ছয়জন আরোহী সেই গাড়িতে। অভিমন্যু ছাড়া আর সবাই মেয়ে। ড্রাইভারের সীটে বসে থাকা মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী।

দলনেত্রী আনোয়ারা নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে গাড়িটা। আনোয়ারার দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই সে ঘাড় না ফিরিয়ে শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে, জিনা, রাবেয়া, অত গা-ঘেঁসে বসিস্ না তোরা। একটু সরে বোস্। লোকটির অসুবিধে হতে পারে।

লজ্জিত ভঙ্গিতে জিনা ও রাবেয়া অভিমন্যুর কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসে।

গাড়ির সীটে ঠেস্ দিয়ে বসে থাকে অভিমন্যু। তার দু'দিকে দু'জন যুবতী। সামনের সীটেও তিনজন যুবতী। এরা কারা?

কোথায় এরা নিয়ে চলেছে তাকে? কী উদ্দেশ্য এদের? এরাই কি তবে বোমা ছুঁড়ে তার পালাবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল?

আনোয়ারা যেন থট্-রিডিং জানে। গাড়ি চালাতে চালাতে সে এবার তার নিজের পাশে বসে থাকা মিলিকে ডেকে বললে, মিলি, পেছনের লোকটি সংকোচ বোধ করছে বলেই বোধহয় কিছু জিজ্ঞেস করছে না। কিন্তু বুঝতে পারছি, ওর মনে লক্ষ প্রশ্নের মেলা। তুই বরঞ্চ ওকে মোটামুটি ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল্।

—হ্যাঁ, বলছি আনোয়ারাদি। বলেই মিলি একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে পেছনের লোকটির উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, দেখুন, আপনি সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছেন যে আমরাই জেল গেটে বোমা ছুঁড়ে আপনাকে উদ্ধার করেছি। হ্যাঁ, ঠিকই তাই; আমরাই উদ্ধার করেছি আপনাকে, ফাঁসির হাত থেকে আপনাকে বাঁচিয়েছি। তবে বিনে উদ্দেশ্যে একাজ করি নি আমরা। উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে।

মিলি একটু থামতেই তার পাশে বসে থাকা পান্নু মৃদু কণ্ঠে বললে, আমাদের উদ্দেশ্যের কথা এই মুহূর্তে ওকে না বলাই বোধহয় ভালো।

পান্নুর কথায় আনোয়ারা মাথা নেড়ে সায় দেয়। মিলি আবার অভিমন্যুকে উদ্দেশ করে বলতে থাকে, আমরা হচ্ছি একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সদস্যা। আমাদের সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যেই আপনাকে আমরা উদ্ধার করে নিয়ে চলেছি।

—কিন্তু আমি তো রাজনীতি বুঝি না। কোনদিন রাজনীতি করিও নি। তাই বুঝতে পারছি না কেমন করে আমি আপনাদের কাজে লাগবো।

—যখন বুঝিয়ে দেব তখন ঠিকই বুঝতে পারবেন। ফিক্ করে একটু হেসে রাবেয়া কথাটা বলতেই আনোয়ারার গম্ভীর কণ্ঠ আবার জেগে ওঠে, রাবেয়া, তোকে কিছু বলতে বলিনি। সব কথার মধ্যে ফোঁড়ন কাটা তোর একটা অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এটা কিন্তু মোটেই ভালো নয়।

আনোয়ারার কাছে ধমক খেয়ে ম্লান মুখে চুপ করে থাকে রাবেয়া। বলতে থাকে মিলি, হ্যাঁ, আপনি আমাদের কাজে লাগবেন। আমাদের সাহায্যে আপনি যেমন পালিয়ে আসতে পেরেছেন, তেমনি আমরাও আশা করবো আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

—নিশ্চয় করবো, অভিমন্যুর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর, আমাকে দিয়ে যতটা সম্ভব ততটা সাহায্যই আপনারা পাবেন। আপনারা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

আবার কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। নীরবতা ভঙ্গ করে এবার অভিমন্যুই বললে, আমরা এখন কোথায় চলেছি জানতে পারি কি?

আনোয়ারার ইঙ্গিতে জিনা জবাব দেয়, আমাদের আস্তানায়।

অভিমন্যু আর কিছু না বলে চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়। কী আশ্চর্য, সে কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল যে এদেশে এসে একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাকে মিশে যেতে হবে! ভেবেছিল, কাজলকে উদ্ধার করে ও একবার সমাপ্তিকার সঙ্গে দেখা করেই সে চলে যাবে। প্রথম কাজটি শেষ হয়েছে। সোমনাথ ও কাজল এখন বোধহয় নিজেদের দেশে ঘর-সংসার করছে। কিন্তু সমাপ্তিকার সঙ্গে দেখা হলো না। তারপরে এলো ফাঁসির হুকুম। আর সবশেষে এই নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সদস্যাদের খপ্পরে।

গাড়ি এসে সেই পোড়ো বাড়িটার সামনে দাঁড়ায়। মেয়েদের দলটি অভিমন্যুকে নিয়ে ঢোকে বাড়ির মধ্যে।

ভাঙ্গা বাড়ির ময়লা-আবর্জনার স্তূপ চারিদিকে। নোনা ধরা দেয়ালের সোঁদা গন্ধ। ভাঙ্গা দেয়ালের কোণে শালিক ও চড়ুইয়ের বাসা।

দলটি অভিমন্যুকে নিয়ে দোতলা ও তেতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে একখানা ঘরে এসে হাজির হয়। বলতে গেলে গোটা বাড়িতে, এই একখানা ঘরের চেহারাই যা একটু ভদ্র। মেঝের মোজায়েক

এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি, দেয়ালে ফ্রেস্‌কো পেইন্টিং-এর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

আসবাবপত্রের মধ্যে একখানা মাঝারি ধরনের খাট, সুদৃশ্য বেড্‌-কভার দিয়ে বিছানাটা ঢাকা, একটি গোল টেবিল ও খান দুই চেয়ার।

অভিমন্যু ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসতেই আনোয়ারা আর একটা চেয়ার অধিকার করে বসে। বাকি চারজন দাঁড়িয়ে থাকে তাদের ঘিরে।

আনোয়ারার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করে তাকেই দলনেত্রী বলে অনুমান করতে ভুল হয় না অভিমন্যুর। সে জিজ্ঞেস করে, এটাই বুঝি আপনাদের আস্তানা?

—হ্যাঁ, মাথা নাড়ে আনোয়ারা।

—এই পোড়ো বাড়িতে থাকতে আপনাদের ভয় করে না?

—কিসের ভয়, ভূতের? বলেই আনোয়ারা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। অভিমন্যু লক্ষ্য করে, হাসির সময় তার সুন্দর গালের পাশে টোল পড়ে।

—না-না, ভূতের কথা বলছি না আমি। এই ধরুন চোর—গুণ্ডা—বদমাশ—।

—ওরা আর কোন্ দেশে নেই? সব দেশেই আছে। তবে তারা নিজেরাই সাহস পায় না আমাদের কাছে ঘেঁসতে। তা'ছাড়া ভুলে যাচ্ছেন কেন যে তারাও আমাদের মতই মেয়ে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক্। ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা। এই প্রমীলা রাজ্যে সবাই তো মেয়ে। কেবল আমিই একমাত্র পুরুষ।

—হ্যাঁ, লক্ষ গোপিনীর মাঝে আপনাদের বৃন্দাবনের কানুর মত। কথাটা মুখ ফস্কে বলে ফেলেই তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দেয় রাবেয়া। তার কথার ভঙ্গিতে ধমক দিতে গিয়েও এবার হেসে ফেলে আনোয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে অভিমন্যু, মিলি, জিনা ও পানুও হেসে ওঠে। কলকণ্ঠের কাকলী যেন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

আনোয়ারা রাবেয়াকে দেখিয়ে বললে, এই পাগলীটার কথায় যেন আপনি কিছু মনে করবেন না। ও যে কখন কি কথা বলে ফেলে তা' ও নিজেই জানে না।

হাসি থামিয়ে অভিমন্যু বললে, এবার কাজের কথায় আসুন। আপনাদের রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলুন। তারপর বলুন আপনাদের পরিকল্পনার কথা। কেমন ভাবে আপনারা আমাকে কাজে লাগাতে চান।

জবাব দেয় আনোয়ারা, এত তাড়াতাড়ি কেন? সেসব বলার মত সময় অনেক আছে। এখন সর্বপ্রথম আমাদের বিশেষ করে আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

—নিরাপত্তার ব্যবস্থা?

—হ্যাঁ, মনে করেছেন নাকি পুলিশ আমাদের ছেড়ে দেবে? এদেশের পুলিশকে আপনি চেনেন না। এরা আঁঠার মত লেগে থাকবে আমাদের পেছনে। সেদিন নাকি একজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী পালিয়েছে। আজ আবার পালালো একজন ফাঁসির আসামী যে নাকি একজন পুরুষ।

একটু থেমে আবার বলতে থাকে আনোয়ারা, পুলিশ ভালমতই জানে আপনি এই প্রমীলা রাজ্য ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না। এদেশেই আপনি রয়েছেন। কাজেই তারা আপনার খোঁজে গোটা রাজ্য তোলপাড় করে ছাড়বে।

কথাটা শেষ করেই আনোয়ারা জিনার দিকে তাকিয়ে বললে, জিনা, তুই পুলিশের হাল-চালের খবর নিতে বেরিয়ে পড়। আর পানু, তুই চলে যা আমাদের দুই ও তিন নম্বর শেল্টারে। সেখানে গিয়ে গুহাগুলো ভালো মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে গুহা-মুখে ভালো করে পাথর চাপা দিয়ে ফিরে আসবি। মিলি, তুই চার নম্বর শেল্টারে গিয়ে গুলি-বন্দুকগুলো একবার তদারক করে আয়, আর সেই সঙ্গে দলের অন্যান্যদেরও সাবধান করে দিয়ে আসবি। আমি নিজে এবার

বাজারের দিকে যাবো আমাদের এই অতিথির জন্যে কিছু কেনা-কাটা করতে। রাতের রান্নার ব্যবস্থাও আমিই করবো। আর রাবেয়া—তুই কি করবি? হ্যাঁ, তুই এখানেই থাক্ এই অতিথির দিকে নজর রাখতে।

আনোয়ারার হুকুম শুনে জিনার মুখখানা একটু ম্লান হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তার ইচ্ছে ছিল রাবেয়ার ডিউটিটা সে নিজে করে। কিন্তু দলনেত্রীর হুকুম অমান্য করা চলে না। তাই সে যাবার আগে রাবেয়াকে উদ্দেশ করে মিলিকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, আনোয়ারাদি যেন কি! বেড়ালকে রেখে যাচ্ছে মাছের পাহারায়।

সঙ্গে সঙ্গে পানুও মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে, কেবল বেড়ালের দোষ দিয়ে কি হবে? সময় সময় মাছও কিন্তু বেড়াল ছানাকে গিলে ফেলে। অবশ্যি মাছটা যদি বোয়াল হয়।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ঘরের ভেতর একটা লণ্ঠনের মৃদু আলো। সেই আলোয় মুখোমুখি বসে ছিল অভিমন্যু ও রাবেয়া। সপ্তদশী তরুণী রাবেয়া আর আঠাশ বছরের যুবক অভিমন্যু।

অভিমন্যু জিজ্ঞেস করে, আপনারা সবাই মিলে এখানে থাকেন?

—না, সবাই থাকবো কেমন করে? দলটা আমাদের নেহাত ছোট নয়। কয়েক হাজার সদস্য আছে আমাদের, তাদের মধ্যে আমরা এই পাঁচজনই মাত্র হোল-টাইমার। বাকিরা ঘর-সংসার, কাজ-কর্ম করে। দরকার মত আমাদের সাহায্যও করে।

—আপনাদের বুঝি চারটা আশ্রয়স্থল আছে?

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে রাবেয়া। তারপর হাসতে হাসতে বললে, চারটা নয়, চব্বিশটা। পুলিশের নজর এড়াতে একটা শেণ্টারে সাত দিনের বেশি থাকি না আমরা।

—আপনাদের পার্টির খরচ চালায় কারা?

—দেশের কিছু ধনী আছে যারা সরকারের ওপর খুশি নয়। তারাই নিয়মিত টাকা জোগায়।

অভিমন্যু একটু সময় চুপ করে থাকে। সেই ফাঁকে রাবেয়া জিজ্ঞেস করে তাকে, আপনি তো শুনেছি আপনার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এদেশে এসেছিলেন একটি মেয়েকে মুক্ত করতে। মেয়েটির সঙ্গে আপনার সেই বন্ধুকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি নিজে কেন রয়ে গেলেন এদেশে ?

রাবেয়ার কথায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে অভিমন্যু। সেই ভাবেই সে জবাব দেয়, পালাতে আর পারলাম কোথায় ? কাজ শেষ না হলে কি করে পালিয়ে যাই ?

—কি কাজের জন্যে এসেছেন ?

সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে ওঠে অভিমন্যু। তাড়াতাড়ি বললে, না—না, কাজ আর তেমন কি ? তবে যে অবস্থায় পুলিশ আমাদের তাড়া করেছিল তাতে আমরা তিনজনই হয়তো ধরা পড়তাম। তাই ওদের বাঁচাতে গিয়ে আমি পড়ে রইলাম আপনাদের দেশে।

খানিকক্ষণ পরে অভিমন্যু আবার জিজ্ঞেস করে, আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, আমি আপনাদের কি কাজে লাগবো।

জবাব দেয় রাবেয়া, বললাম তো তখন, বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারবেন। তবে, আপনাকে বোঝাবার ভার তো আমার ওপর নেই। বোধহয় আনোয়ারাদিই কথাটা সময়মত আপনাকে বলবে।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে ?

—একটা কেন, একশোটা করতে পারেন, হেসে জবাব দেয় রাবেয়া।

—আচ্ছা, পুরুষহীন এই প্রমীলারাজ্যে আপনাদের কষ্ট হয় না ?

—কিসের কষ্ট ? মিটি মিটি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে রাবেয়া।

জবাব দেয় অভিমন্যু, একঘেয়েমির কষ্ট—বৈচিত্র্যহীনতার কষ্ট।

—যারা কখনও বৈচিত্র্যের স্বাদ পায় নি তাদের কাছে তো বৈচিত্র্যহীনতাই স্বাভাবিক। ওতে আর কষ্ট কি ?

—তা বটে। মাথা নেড়ে সায় দেয় অভিমন্যু। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, আপনাদের কি স্বামী-সংসার নিয়ে ঘর-কন্না করতে সাধ জাগে না?

—জাগবে না কেন? তবে সাধ্য নেই। পুরুষ কোথায় এদেশে?

—আপনাদের এ রাজ্যে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ কেন?

—কারণ, আপনারা পুরুষেরা মেয়েদের ওপর আধিপত্য করেন।

—পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তাই তো স্বাভাবিক।

—মাতৃতান্ত্রিক সমাজ তৈরি করেন না কেন?

—তাতে যে আমাদের লোকসান। বলেই হেসে ওঠে অভিমন্যু। রাবেয়াও হাসতে হাসতে জবাব দেয়, সত্যি কথাটা বলে ফেলেছেন কিন্তু। আপনারা বাস্তবিকই স্বার্থপর।

—তা যা বলেছেন। অভিমন্যু জবাব দেয়। তারপর একটা হাই তুলে আবার বললে, আপনাদের রান্না-বান্না কখন হবে?

—দেরি আছে। আনোয়ারাদি বাজার করে আসুক আগে।

ঠিক এমনি সময় বাইরে বহুদূরে ভেসে ওঠে একটা মিষ্টি বাঁশির সুর। অভিমন্যু কান খাড়া করে সেই সুর শুনতে শুনতে বললে, বাঃ চমৎকার! আমাদের দেশে কিন্তু মেয়েরা সাধারণতঃ বাঁশি বাজায় না। আচ্ছা, আপনি গান-বাজনা জানেন?

—জানতাম এককালে, এখন ভুলে গেছি।

—কেন, চর্চা করেন না?

—না, সময় পাই না। বেহালা শিখবো বলে একটা বেহালা কিনেও ছিলাম, কিন্তু শিখবার আর সময় হলো না।

—বেহালাটা আছে আপনার কাছে?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রাবেয়া বললে, আছে।

—আনতে পারেন?

—কেন পারবো না? কিন্তু বাজাবে কে? আপনি?

—দেখি না একটু চেষ্টা করে।

রাবেয়া উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একটা সস্তাদামের বেহালা নিয়ে আসে। অভিমন্যু সেটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে বললে, এমন সুন্দর বেহালাটা বাজান না কেন?

রাবেয়া কোন জবাব দেয় না। অভিমন্যু বেহালার তারগুলোকে একটু ঠিক্ করে নিয়ে ছড়ে টান দিতেই রাবেয়া বুঝতে পারে অভিমন্যু কেবল বেহালা বাজাতেই জানে না, এই যন্ত্রটির ওপর তার প্রচুর দখল।

এক মিনিট দু'মিনিট করে পুরো একটি ঘণ্টা কেটে যায়। বেহালায় গাল ঠেকিয়ে চোখ বুজে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে চলেছে অভিমন্যু। সুরের মূর্ছনায় ভারি হয়ে উঠেছে ঘরের বাতাস। তার মুখের পানে পলকহীন চোখে তাকিয়ে সেই সুরের রসসুধা পান করে চলেছে সপ্তদশী রাবেয়া। তারা কেউই টের পায় নি কখন একে একে আনোয়ারা, মিলি, জিনা ও পানু তাদের নিজেদের কাজ শেষ করে ফিরে এসে ঐ সুরের আকর্ষণে বন্দী হয়ে পড়েছে।

অবশেষে একসময় থেমে যায় সেই সুর। হাতের ছড়্ নামিয়ে চোখ মেলে তাকায় অভিমন্যু। তারপর আনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বললে, কখন এলেন?

জবাব দেয় আনোয়ারা, অনেকক্ষণ, তবে তপস্বীর তপোভঙ্গ করতে ইচ্ছে হয় নি।

মিলি বলে ওঠে, সত্যিই অপূর্ব!

জিনা ও পানু একসঙ্গে তারিফ করে বললে, মার্ভেলাস্!

রাবেয়া কিন্তু একটি কথাও বলতে পারে না। সে কেবল ছলছল্ চোখে তাকিয়ে থাকে অভিমন্যুর দিকে। তার কেবলই মনে হতে থাকে, সে যেন কি হারিয়েছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।

একদিন দু'দিন করে তিনটি দিন কেটে যায়। ঘরের বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা অভিমন্যুর জানালার কাছে দাঁড়ানোও

নিষেধ। বলা তো যায় না, কে কখন দেখে ফেলে পুলিশে খবর দেবে!

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় আনোয়ারা অভিমন্যুকে ভাঙ্গা ছাদে পায়চারি করতে পাঠিয়ে দেয়। যাবার আগে সাবধান করে দেয়, দেখবেন, পড়ে গিয়ে যেন হাত-পা ভাঙ্গবেন না। ছাদ কিন্তু ভাঙ্গা।

যেতে যেতে অভিমন্যু হেসে বললে, এতদিন পরে যখন খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াবার অনুমতি দিয়েছেন তখন আনন্দের আতিশয্যে হাত-পা ভাঙ্গতেও পারি।

পরিষ্কার নীল আকাশে নক্ষত্রের মেলা। সমুদ্রের বাতাস বইছে ধীরে ধীরে। খোলা ছাদে আপন মনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে অভিমন্যু, আর মনে মনে ভাবছে সমাপ্তিকার কথা। এই মুহূর্তে সেও কি গভর্ণর প্যালেসের ছাদে উঠে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে তার মত? এই মুহূর্তে তার কি একবারও মনে পড়ছে না অভিমন্যুর কথা?

পূর্ণিমার পরে প্রতিপদের চাঁদ উঠলো পূব আকাশে। জ্যোৎস্নায় ভরে উঠলো চারিদিক।

সহসা পেছনে পায়ের শব্দ। ঘুরে দাঁড়ায় অভিমন্যু। একি সাজ সেজেছে আজ আনোয়ারা! ওকি, পেছনে কে? মিলি না? তারও আজ এমন সাজের ঘটা কেন? না—না, আনোয়ারা আর মিলিই কেবল নয়, সবাই রয়েছে পেছনে—পান্নু, জিনা, রাবেয়া। প্রত্যেকের অঙ্গেই আজ অপরূপ পোশাক।

সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরেছে আনোয়ারা ও রাবেয়া। মাথায় তাদের ওড়না। মিলি ও পান্নুর অঙ্গে সিল্কের শাড়ি, আর জিনা পরেছে দামী স্কার্ট। প্রত্যেকেই মুখেই আজ প্রসাধনের স্পষ্ট চিহ্ন। চোখে সুর্মা বা কাজলের রেখা। গায়ে তাদের ইরানী আতরের মিষ্টি সুবাস।

অভিমন্যু কিছু বুঝতে না পেরে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে

থাকে তাদের দিকে। সেইমুহূর্তে ওদের কোনরকম প্রশ্ন করতেও যেন ভুলে যায় সে।

অভিমন্যুর বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে আনোয়ারা বললে, খুব অবাক হয়েছেন, তাই না? আসুন, এখানে এসে বসুন। তারপর সব বলছি।

জ্যোৎস্নায় খোলা আকাশের নীচে অভিমন্যুকে ঘিরে বসে পাঁচজন যুবতী। সমস্ত ব্যাপারটাকেই কেমন যেন রহস্যময় মনে হয় অভিমন্যুর। কি উদ্দেশ্য এদের? কেন এরা তাকে উদ্ধার করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছে?

পাঁচজন সুন্দরী যুবতীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পর্শে অভিমন্যুর দেহের রক্ত উষ্ণতর হয়ে ওঠে, ওদের দেহের সুবাসে তার মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে, ওদের চোখের দৃষ্টিতে তার মনটা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে ওঠে। এমন একটা পরিবেশে মাত্র একজোড়া চোখের দৃষ্টি যেখানে একজন যুবকের মনকে অসাড় করে তুলতে যথেষ্ট সেখানে পাঁচজোড়া চোখের কটাক্ষ সেই মুহূর্তে সহ্য করতে পারছিল না অভিমন্যু। ইচ্ছে করছিল নিজেকে ওদের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে, ইচ্ছে করছিল নিজেকে হারিয়ে ফেলতে।

মাথার ওড়নার ঘোমটা ঈষৎ সরিয়ে আনোয়ারা অভিমন্যুকে বলতে থাকে তাদের দলের কথা, তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, তাদের আদর্শের কথা। শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ে অভিমন্যু।

আনোয়ারা অবশেষে জিজ্ঞেস করে, এবার আপনিই বলুন, আমরা কি কোন ভুল আদর্শের পিছে ছুটে চলেছি? নারী-পুরুষের মিলিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা কি অন্যায়?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় অভিমন্যু, না—না, কখনই অন্যায় নয়। এই মিলিত জীবনই তো ভগবানের অভিপ্রেত।

দৃঢ় কণ্ঠে বলতে থাকে আনোয়ারা, তাই এদেশের এই অন্যায়

আইন অমান্য করতে আজ আমরা প্রস্তুত হয়েছি। আর এই কাজে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

সন্দেহহীন চিত্তে জবাব দেয় অভিমন্যু, আমার সাহায্য আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন।

একটু সময় থেমে আনোয়ারা অন্য মেয়েদের মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। তারপর অচঞ্চল কণ্ঠে বলতে থাকে, স্ত্রী-পুরুষের মিলিত জীবন এরাজ্যে বে-আইনী। সেই বে-আইনী কাজই আজ আমরা করবো। এই জ্যোৎস্না রাতে আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে আমরা আপনাকে বিয়ে করবো।

চলতে চলতে সামনে অদ্ভুত একটা কিছু দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, আনোয়ারার কথায় তেমনি নিদারুণ চমকে ওঠে অভিমন্যু। মুখখানা তার হঠাৎ ম্লান হয়ে ওঠে—এ কি শুনছে সে ?

অভিমন্যুর ম্লান মুখের পানে তাকিয়ে মিলি, জিনা, পান্নু ও রাবেয়া আবেগময় কণ্ঠে একসাথে বলে ওঠে, হ্যাঁ, আজ এই মুহূর্তে আমরা সবাই আপনাকে স্বামী রূপে পেতে চাই। বলুন আপনি রাজি ?

গলাটা শুকিয়ে উঠেছে অভিমন্যুর। একটা ঢোক গিলে কোন রকমে সে জবাব দেয়, তা—তা কি করে সম্ভব ?

—কেন, অসম্ভব কেন ? জিজ্ঞেস করে মিলি।

জবাব দেয় অভিমন্যু, একসঙ্গে পাঁচজনকে—

বলে ওঠে জিনা, এতে আমরা যদি রাজি হই তো আপনার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে ? আপনাকে তো আর আমাদের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব নিতে হবে না। বরঞ্চ আমরাই তো আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবো।

—না—না, ভরণ-পোষণের কথা আমি ভাবছি না। এমনিভাবে আইন অমান্য কি না করলেই নয় ?

—তা'হলে আপনিই বলুন, আইন না ভেঙ্গে আইন অমান্য করা চলে কেমন করে ? পান্নু প্রশ্ন করে।

অভিমন্যু কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। এই প্রশ্নে কোন সঠিক জবাব সেই মুহূর্তে সে দিতে পারে না।

এবার মিনতির সুর জেগে ওঠে রাবেয়ার কণ্ঠে, আমরা সবাই মনে মনে আপনাকে পতি-রূপে বরণ করে নিয়েছি। আমাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান সবই আছে। এদেশে কারুর বিয়ে হয় না, তাই পুরুত মৌলভী কিম্বা ধর্মযাজক কিছুই নেই। বিয়ের অনুষ্ঠান কেমন করে হয় তাও আমরা জানি না। তবে এটুকু জানি, এককালে নাকি আপনাদের দেশে গান্ধর্ব বিবাহ নামে একধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল কেবলমাত্র মালা বদল করেই নাকি সেই বিবাহ সম্পন্ন হতো আমরাও তাই আজ সেজে-গুজে প্রস্তুত হয়ে এসেছি। গান্ধর্ব মতেই আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আজ বিয়ে হবে আপনার। আমরা হবে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী।

কেমন যেন বিরক্তি বোধ করে অভিমন্যু। এ কি অসম্ভব প্রার্থনা। এ কি অন্যায় আবদার! এ যুগে বিয়ে মানে কি শুধু স্ত্রী-পুরুষের একই ঘরে বসবাস, একই শয্যায় শয়ন? প্রেম ভালোবাসা প্রভৃতি শব্দগুলো কি অর্থহীন? এ যুগের যুবক হয়ে সেকালের মত আগে বিয়ে পরে ভালোবাসায় তার বিশ্বাস নেই। স্ত্রী-পুরুষের মনের মিলই যদি না হলো, তা'হলে তাকে কোন মতেই বিয়ে বলা চলে না। তা ছাড়া, একজন যুবক একই সঙ্গে পাঁচজন যুবতীকে কিছুতেই ভালো বাসতে পারে না।

অভিমন্যুকে চুপ করে থাকতে দেখে রাবেয়া আবার মিনতি করে, চুপ্ করে রইলেন কেন? কিছু বলুন।

—কি আর বলবো? বলার মত কোন কথাই যে খুঁজে পাচ্ছি না।

আনোয়ারা আবার বলতে থাকে, তবে একটা কথা শুনুন। এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে কোনদিনই আপনি পারবেন না। সে সুযোগ আপনার নেই। কাজেই পুলিশের ফাঁসির দড়ি যদি এড়াতে চান তো

বরাবর আপনাকে পালিয়েই বেড়াতে হবে। এই বিয়েতে আপনি যদি মত দেন তা'হলে আপনার পক্ষে পালিয়ে বেড়ানো সহজ হবে। আমরাই নিজেদের স্বার্থে আপনাকে আগলে রাখবো। কোন স্ত্রীলোকই স্বামীর অমঙ্গল চায় না। আর সেই অবস্থায় যদি আপনি ধরাও পড়েন তা'হলেও আপনাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবার আগে দেশের মানুষের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে দেশের সরকারকে দশবার চিন্তা করতে হবে।

আনোয়ারার এই যুক্তিকে সহসা খণ্ডন করতে পারে না অভিমন্যু। তবুও কেন যেন তার বারে বারে মনে হতে থাকে, এই পাঁচজন যুবতী কেবলমাত্র তাদের দৈহিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্যেই তাকে ব্যবহার করতে চাইছে। সে সম্মত না হলে হয়তো এরা জোর করেই তার সম্মতি আদায় করে তার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তাকে পতি-রূপে বরণ করবে।

অভিমন্যুকে চুপ করে থাকতে দেখে মিলি মিনতি ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ। সেই লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে আমরা সবাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে আমাদের সাহায্য করুন। বিশ্বাস করুন এতে আপনার কোনই ক্ষতি হবে না। আপনি সাহায্য না করলে আমরা যে নিরুপায়।

আরও কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চিন্তা করে অভিমন্যু। সহসা মনটা নরম হয়ে ওঠে তার। ইচ্ছে করে এদের কাতর অনুনয়ে সাড়া দিতে। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় সমাপ্তিকা। সে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। যেন বলতে চাইছে—বলো এবার, কি করতে চাও, বলো। জবাব দাও ওদের।

মাথা নীচু করে বসে রয়েছে একটি সুশ্রী যুবক, আর তাকে ঘিরে পাঁচটি সুন্দরী যুবতী বিয়ের সাজে সেজে তার সম্মতির আশায় তাকিয়ে আছে তারই দিকে। মুখে তাদের উৎকণ্ঠার চিহ্ন, চোখে তাদের

আশা-নিরাশার আলো-অন্ধকার, মনে তাদের আইন ভাঙ্গার দুর্জয় সঙ্কল্প।

অনুনয়ের সুরে বলতে থাকে আনোয়ারা, দয়া করে এই ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেখবেন না। এর পেছনে রয়েছে আমাদের আদর্শ, আমাদের দলের ভালো-মন্দের প্রশ্ন। স্বীকার করছি, আমাদের মধ্যে এখনও কোন ভালোবাসা জন্মগ্রহণ করে নি। নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে চাইছি। তবে এটাও ঠিক যে এর মধ্যে কোন দৈহিক আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব নেই। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের সুখ আমরা চাই, কিন্তু তার চাইতেও বেশি চাই আমাদের আদর্শকে জীইয়ে রাখতে।

মাথা না তুলেই অভিমন্যু আনোয়ারার কথা শুনছিল। এবার সে ধীরে ধীরে মাথা তোলে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি যুবতীর মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অবশেষে সে স্থির চোখে তাকায় আনোয়ারার অনিন্দ্য সুন্দর মুখের দিকে। তারপর আবেগময় সুরে বলতে থাকে, আমি আপনাদের জন্যে সবকিছু করতে পারি, কিন্তু পারি না এমন একজন নারীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাকে আমি ভালোবাসি। আপনাদের কথামত চললে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করা হবে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

—কে সেই নারী? জিজ্ঞেস করে রাবেয়া।

—কোথায় থাকে সে? প্রশ্ন করে মিলি।

—কোথায় আপনারা প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ হলেন? জানতে চায় জিনা।

—খুব সুন্দরী বুঝি সে? জবাব চায় পানু।

আর, আনোয়ারা কিছু জিজ্ঞেস না করে কেবল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অভিমন্যুর মুখের দিকে।

জবাব দেয় অভিমন্যু, তার পরিচয় দেওয়া এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে আপনাদের এই প্রমীলা রাজ্যেরই অধিবাসী।

কেবলমাত্র তাকে একবার চোখের দেখা দেখতেই আমি এসেছি আপনাদের এই দেশে।

—কেবল চোখের দেখা দেখতে? কেন, তার সঙ্গে মিলিত হতে নয় কেন? জিজ্ঞেস করে জিনা।

ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয় অভিমন্যু, না, মিলিত হতে নয়। সে স্পর্দ্ধা আমার নেই। কারণ সে আমাকে ভালোবাসে বলে আমি মনে করি না।

বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে আনোয়ারা, সে কি? যে আপনাকে ভালোবাসে না তাকে কেবলমাত্র চোখের দেখা দেখতেই আপনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিলেন?

এক নিদারুণ অভিমান-জ্বালায় সহসা হৃদয়াবেগ উদ্দীপিত হয়ে ওঠে অভিমন্যুর। খানিকক্ষণ চুপ্ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে তেমনি ভারি কণ্ঠে সে জবাব দেয়, হ্যাঁ, সে আমাকে ভালো না বাসলেও আমি তাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার পাত্রীর জন্যে প্রাণ দেওয়া তো তেমন কিছু শক্ত কাজ নয়। তবে আমার দুঃখ এই যে তাকে হয়ত শেষ পর্যন্ত সেই চোখের দেখাটুকুও দেখতে পাবো না। তার আগেই হয়তো মৃত্যু ছিনিয়ে নেবে আমাকে। সেই অতৃপ্তি নিয়েই বোধহয় আমাকে চলে যেতে হবে।

—একটি মেয়ের জন্যে এতখানি করতে পারেন আপনারা?

প্রশ্নটা রাবেয়া করলেও এটা তার একার প্রশ্ন নয়। উপস্থিত পাঁচটি যুবতীর মনের কোণেই দেখা দিয়েছিল প্রশ্নটি। হয়তো প্রত্যেকের সেই না-দেখা নারীর সৌভাগ্যে সেই মুহূর্তে মনে মনে একটু ঈর্ষাবোধও করছিল তারা।

ম্লান হেসে জবাব দেয় অভিমন্যু, এ জগতে প্রেমের জন্যে কত ঘটনাই না ঘটেছে। রাজা রাজ্য ত্যাগ করেছে, যোগী যোগ ছেড়েছে, সন্ন্যাসী তার হাতের মুঠোয় পরম-পাওয়াকে পেয়েও তা' হারিয়েছে। আর, প্রেমের জন্যে প্রাণ দেওয়ার নজীর তো গোটা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে রয়েছে।

অভিমন্যুর মুখে প্রেমের মহিমা শুনতে শুনতে জ্যোৎস্নালোকিত খোলা আকাশের নীচে পাঁচটি যুবতী নারী স্তব্ধ বিস্ময়ে বসে থাকে। এ যেন অভিমন্যুর কণ্ঠস্বর নয়, এ যেন কোন্ কল্পলোক থেকে ভেসে আসা এক স্বর্গীয় বার্তা যার খোঁজ তারা এতকাল পায় নি। এ যেন এক সুষমামণ্ডিত অতীন্দ্রিয় আলোক রশ্মি যার কাছে চাঁদের জ্যোৎস্নাও অতিশয় ম্লান।

ভাববিভোর পাঁচটি নারীই এক সময় উঠে দাঁড়ায়। তারপর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আনোয়ারা বললে, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের প্রস্তাব আমরা তুলে নিচ্ছি। এই প্রমীলা রাজ্যে আমাদের সতর্ক পাহারায় আরও কিছুদিন আপনি লুকিয়ে থাকুন। পুলিশের প্রখর দৃষ্টি একটু শিথিল হলে আমরাই আপনাকে সেই সৌভাগ্যবতীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো।

বলতে বলতে যেমন নিঃশব্দে তারা ছাদে উঠে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই নেমে গেল নীচে। যাবার আগে তারা সেখানেই ফেলে গেল পাঁচগাছা রজনীগন্ধা ফুলের মালা।

রাবেয়া কেবল ছল্ ছল্ চোখে মৃদু কণ্ঠে বলে গেল অভিমন্যুকে, অক্ষয় হয়ে থাক্ আপনার প্রেম।

॥ তের ॥

গোটা প্রমীলা রাজ্য জুড়ে একটা চাপা উত্তেজনা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একজন অপরাধী পালিয়েছে। যে-সে অপরাধী নয় সে, একজন জ্বলজ্যান্ত পুরুষ। বোমা ছুঁড়ে পুলিশ ও জেল ওয়ার্ডেনদের কাবু করে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কে একাজ করেছে? একজন লোকের কাজ নয় এটা। নিশ্চয়ই একটা দল রয়েছে এর পেছনে। কিন্তু তারা কারা? কি উদ্দেশ্যে তারা সেই লোকটাকে মুক্ত করে নিয়ে পালিয়েছে?

সরকারী মহল চিন্তিত, পুলিশ কমিশনার ডোরোথি স্তম্ভিত। এমন

যে একটা ঘটতে পারে তা' ছিল তার ধারণারও অতীত। কিছুদিন আগেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একটা মেয়েকে নিয়ে একজন পুরুষ এদেশ ছেড়ে পালিয়েছে। পুলিশ তাদের ধরতে পাবে নি, আর কোনদিন পারবেও না। আর, এবারে পালালো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একজন পুরুষ অপরাধী।

সরকারী মহল থেকে প্রচণ্ড চাপ আসছে ডোরোথির ওপর। স্বয়ং গভর্নর পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠেছে। এমন একজন বিপজ্জনক মানুষকে জেলের বাইরে রাখা কিছুতেই চলে না। বিশেষ করে, এমন একজন যুবাপুরুষ বাইরে ছাড়া থেকে এদেশের অনেক অনিষ্টই করতে পারে। শত শত মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে, তাদের মনে পুরুষ-সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারে। এমন কি লোকটা যদি তেমন চরিত্রের হয় তা'হলে সে একাই কয়েক শত নারীর চিব-কৌমার্যের ব্রত ভাঙ্গিয়ে নতুনের আগমনের পথ সুগম করে তুলতে পারে। আর, তার ফলে প্রমীলা রাজ্যের মূল কাঠামোটারই ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা। কাজেই, এমন ভয়ঙ্কর মানুষটাকে যে করেই হোক্ ধরতে হবে।

পুলিশ কমিশনার ডোরোথি কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। ঐ লোকটা কোন রকমেই দেশের বাইরে পালাতে পারবে না। দেশের মধ্যেই থাকতে হবে তাকে। তাই একদিন না একদিন সে ধরা পড়বেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই যদি সে দেশের চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে তা'হলেই বিপদ।

গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে পুলিশী অভিযান। খোঁজা হচ্ছে প্রতিটি গৃহ তন্ন তন্ন করে। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে উপকূল রক্ষী বাহিনীকে।

রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যেও দারুণ উত্তেজনা। জঙ্গলের বাঘ জঙ্গল ছেড়ে গ্রামে ঢুকলে গ্রামবাসীদের যা অবস্থা হয় প্রমীলা রাজ্যের ঘোরতর পুরুষ-বিদ্বেষীদের অবস্থাও অনেকটা তেমনি। পুরুষহীন এই মেয়েদের রাজ্যে ঐ আপদটা কখন যে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার

সর্বনাশ করবে তার ঠিক্ কি? তাই, তারা তাদের যুবতী মেয়েদের সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

দেশের যুবতী মেয়েদের মনোভাব কিন্তু আবার অন্য রকম। ভয়ের চাইতে একজন যুবাপুরুষ সম্বন্ধে কৌতূহলটাই বড় হয়ে দেখা দেয় তাদের মনে। মানুষটা কেমন দেখতে? কেমন তার চাল-চলন? আর যারা দেহ-মনে সর্বদাই একটা ক্ষুধার অস্তিত্ব অনুভব করে তাদের সতর্ক দৃষ্টি কেবল খুঁজে বেড়াতে থাকে সেই লোকটাকে। এ যেন পথে হারিয়ে যাওয়া এক বহুমূল্য রত্ন, যে কুড়িয়ে পাবে তারই হবে।

দিনের শেষে সবে সন্ধ্যে হয়েছে তখন। বে-আইনী রাজনৈতিক দলটির তিন নম্বর শেল্টার হচ্ছে একটি গুহা। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে ঘন জঙ্গলে আবৃত পর্বতশ্রেণীর গায়ে এই গুহাটিই অভিমন্যুর বর্ত্তমান আশ্রয় স্থল। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে এখানেই আজ সাতদিন ধরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

মোটামুটি বেশ আরামেই আছে অভিমন্যু। পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণার জলে সে স্নান করে, গাছের ডালে রং-বেরংয়ের পাখীর কল-কাকলী কান পেতে শোনে, কাঠবেড়ালীর বাদাম নিয়ে ছুটোছুটি করা চোখ মেলে দেখে।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে দলের একজন এসে খাবার দিয়ে যায় তাকে। কিছু সময় তার সঙ্গে কথা বলে অভিমন্যু। জেনে নেয় দেশের খবরা-খবর। এইটুকু সময়ই যা সে মানুষের মুখ দেখতে পায়। তারপর সে চলে যেতেই আবার একা—সম্পূর্ণ একা। প্রকৃতির কোলে নিজেকে সঁপে দেয় অভিমন্যু।

সেদিন সন্ধ্যায় খাবার নিয়ে এলো রাবেয়া। গুহার বাইরে একখানা বড় পাথরের ওপর বসেছিল অভিমন্যু। গুহার মধ্যে অভিমন্যুর রাতের খাবার ঢেকে রেখে রাবেয়া বাইরে আসতেই অভিমন্যু

হেসে বলে ওঠে, বাব্বাঃ, এই ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম দেখা পেলাম আপনার।

সঙ্গে সঙ্গে বেণী দুলিয়ে বলে ওঠে রাবেয়া, এমন আপনি-আপনি যদি করেন তা'হলে আর কোনদিন আসবো না আপনার কাছে। বলেই রাবেয়া গম্ভীর হতে চেষ্টা করে।

হেসে উঠে অভিমন্যু বললে, ঠিক আছে। বয়সে তুমি অনেক ছোট। এবার থেকে তুমিই বলবো।

হাসির ঝিলিক দেখা দেয় রাবেয়ার মুখে। অভিমন্যুর পাশে পাথর খানার এক কোণে বসতে বসতে বললে, কেমন আছেন?

—ভালো—খুব ভালো। তবে বড্ড একা-একা লাগে।

—তা' তো লাগবেই। এই গহন বনে ঐ পাখী আর কাঠবেড়ালী ছাড়া কে আর আপনার সঙ্গী হতে পারবে? যে পারতো, তাকে তো এখনও একবার দেখতেও পান নি। বলেই আবার গম্ভীর হয়ে ওঠে রাবেয়া।

—হ্যাঁ, তা ঠিক, যে পারতো তার দেখা আমি আজও পাই নি। কোনদিন পাবো কিনা তাও জানি না। বলেই একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছাড়ে অভিমন্যু।

রাবেয়া অভিমন্যুর মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে বললে, খুব কষ্ট হয় তার জন্যে, না?

অভিমন্যু সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, এই ক'দিনে সবাই এসেছে এখানে। এসেছে জিনা, মিলি, পান্নু। এমনকি আনোয়ারাও একদিন এসেছে। কিন্তু তুমিই কেবল আসো নি।

অভিমন্যুর কথা শুনতে শুনতে মুখখানা কেমন যেন ম্লান হয়ে ওঠে রাবেয়ার। জবাব দিতে গিয়ে একটু সময় নেয় সে। তারপর ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললে, এই তো, আজ এসেছি।

—তা' তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এ'কদিন কেন আসো নি তাই জিজ্ঞেস করছি।

হঠাৎ কি যেন হলো। চোখদুটো ছল্ ছল্ করে ওঠে রাবেয়ার। জবাব দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বর আটকে আসে। ধরা গলায় সে বললে, ইচ্ছে করেই আমি আসি নি।

রাবেয়ার এই হঠাৎ ভাবান্তরে একটু যেন বিব্রত বোধ করে অভিমন্যু। তার জবাবে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কেন ?

—ভয়ে। জবাব দেয় রাবেয়া।

—কার ভয়ে, আমার ?

—না, নিজের কাছেই নিজের ভয়।

—কেন ?

—যদি কিছু অন্যায় করে ফেলি। যদি নিজেকে ঠিক রাখতে না পারি ?

—এত দুর্বল তুমি ?

সহসা রাবেয়া একটা কাণ্ড করে বসে। অভিমন্যুর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে তেমনি ধরা গলায় বলতে থাকে, না—না, বিশ্বাস করুন। দুর্বল আমি কোন কালেই ছিলাম না, আমাদের দলে দুর্বলতার স্থান নেই। কিন্তু আপনাকে দেখার পর থেকেই কেমন যেন—

কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় রাবেয়া। অভিমন্যুর হাতখানা সে তেমনি ভাবেই ধরে রাখে নিজের হাতের মধ্যে। অভিমন্যু অনুভব করে, রাবেয়ার চোখের ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ জল গড়িয়ে পড়েছে তার হাতের ওপর।

সেই মুহূর্তে অভিমন্যু নিজেও যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ে। নিজের হাতটা ছাড়িয়ে না নিয়ে তেমনি ভাবেই নিঃশব্দে বসে থাকে।

নিজেকে একটু সামলে নেয় রাবেয়া। তারপর তেমনি ধরা গলায় আবার বললে, একটা অনুরোধ করবো, রাখবেন ?

অভিমন্যু নিঃশব্দে তাকায় রাবেয়ার দিকে।

বলতে থাকে রাবেয়া, ইহজীবনে কোন পুরুষেব কাছ থেকেই যখন

স্বামীর ভালোবাসা পাবো না, তখন অন্ততঃ বোনের ভালোবাসাটুকু চাইছি আপনার কাছে।

নিজেকে আর সামলাতে পারে না অভিমন্যু। সহসা রাবেয়ার মাথাটা দু'হাতে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে সে বলতে থাকে, হ্যাঁ—হ্যাঁ রাবেয়া, তুই আমার বোন—আমার ছোট বোন তুই।

গভীর রাত। গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে অভিমন্যু। আজ যেন কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। তার চোখের সামনে বারে বারে ভেসে উঠছে দু'টি নারীর দু'খানা সুন্দর মুখ—সমাপ্তিকা ও রাবেয়া। একজন প্রেমিকা অন্যজন বোন। একজনের ভালোবাসার কাঙ্গাল সে নিজে, আর অন্যজন তারই ভালোবাসার কাঙ্গাল। সেই রাবেয়াই আজ বোনের সম্মান নিয়ে খুশি মনে ফিরে গেছে তার কাছ থেকে।

সহসা বাইরে একটা শব্দ। কানদুটো খাড়া হয়ে ওঠে অভিমন্যুর।

আবার সেই শব্দ। কে যেন চাপা পাথরখানার ওপর ঘা দিচ্ছে বারে বারে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে অভিমন্যু। গুহার মধ্যে মাটির প্রদীপটি জ্বালায়। কে এলো এই গভীর রাতে? পুলিশ নাকি? আশঙ্কায় বুকটা দুলে ওঠে তার।

আবার শব্দ। পায়ে পায়ে গুহার মুখে এগিয়ে আসে অভিমন্যু। তারপর পাথরের ফাঁকে মুখ রেখে জিজ্ঞেস করে, কে—?

—আমি জিনা—ভেতরে আসতে দিন।

মনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে অভিমন্যুর। নিশ্চয়ই কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে, নইলে এত রাতে জিনা এখানে কেন? তবে কি ওদের দলটা ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে? তবে কি পুলিশ খোঁজ পেয়েছে তার?

ত্রস্ত হাতে অভিমন্যু দরজার পাথরখানা সরিয়ে দিতেই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে জিনা।

শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে অভিমন্যু, আপনি ?—এত রাতে ?

জবাব দেয় জিনা, হ্যাঁ, এত রাতে।

জিনার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে অভিমন্যু। ওর কণ্ঠস্বর এমন জড়ানো কেন ? ওর নিঃশ্বাসে এমন গন্ধ কেন ? তবে কি জিনা মদ খেয়েছে ?

জিনাকে ভালমত লক্ষ্য করতেই অভিমন্যু বুঝতে পারে জিনা কেবল মদই খায় নি, সে মাতাল হয়েছে। পায়ের ওপর তার দেহখানি টলছে।

একটা বিজাতীয় ঘৃণায় মনটা রি-রি করে ওঠে অভিমন্যুর। কিন্তু সে আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই জিনা তেমনি জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, আর থাকতে পারলাম না। তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে। মাই সুইটি ডার্লিং—এসো—এসো—

বলতে বলতে জিনা গুহার দেয়ালে পিঠ রেখে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অভিমন্যু লক্ষ্য করে জিনার সারা মুখে এক প্রচণ্ড কামনার বহ্নি যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

—জিনা—জিনা, একি বিশ্রী ব্যবহার আপনার ? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে অভিমন্যু।

তেমনি জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে জিনা, নো—নো, মাই ডার্লিং, ভয় পেও না। আমি তো চাই না তুমি আমাকে বিয়ে করো। আই ওয়াণ্ট—আই ওয়াণ্ট অন্‌লি—। বলেই একটু বিকৃত হাসি হাসে কেবল।

অভিমন্যু বুঝতে পারে না সেই মুহূর্তে সে কি করবে। জিনা আবার বলতে থাকে, কোন ভয় নেই ডার্লিং, কেউ জানতে পারবে না কিছু। কেবল তুমি আর আমি। অন্‌লি ওয়ান নাইট্—মাত্র এই একটা রাতের জন্যে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মত থাকবো। দেহের জ্বালা জুড়াবো। এসো—এসো—কাছে এসো, মাই ডার্লিং।

বলতে বলতে জিনা হঠাৎ তার গায়ের স্কার্টটা খুলে ফেলে।

মাথাটা ঘুরে ওঠে অভিমন্যুর। সারা দেহে অনুভব করে একটা

উষ্ণ রক্তের স্রোত। প্রদীপের মৃদু আলো এসে পড়েছে জিনার প্রায়-নগ্ন ধবধবে ফর্সা দেহখানির ওপর। পরনে তার কেবল একটি ছোট জাঙ্গিয়া, উন্নত বুকের সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে সামান্য এক টুকরো কাপড়। এ ছাড়া, আর কিছুই নেই তার সর্বাঙ্গে। উত্তেজনায় সেই উন্নত বুকখানা ওঠা-নামা করছে জিনার।

জিনা এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে অভিমন্যুর দিকে। আর সহ্য করতে পারে না অভিমন্যু। অতীত—ভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান সবকিছু ভুলে যায় সে। সমাজ-সংস্কার সবকিছু বিস্মৃত হয়। সর্বাঙ্গে তার জেগে ওঠে এক বিষম জ্বালা। জিনার ঐ নরম সুন্দর দেহখানিকে দলে পিষে নিঃশেষ করে ফেলতে ইচ্ছে হয় সেই মুহূর্তে।

আরও কাছে এগিয়ে এসেছে জিনা। প্রস্তুত অভিমন্যুও। প্রমীলা রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটবে একজোড়া নর-নারীর মিলন। এই প্রথম একজোড়া নর-নারী পরস্পরের কাছে নিজেদের কৌমার্য বিসর্জন দেবে প্রমীলা রাজ্যের মাটিতে।

হঠাৎ কি যেন হল অভিমন্যুর। তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো সমাপ্তিকা। তার পাশে রাবেয়া। সমাপ্তিকার চোখে বিদ্রুপ আর রাবেয়ার চোখে তিরস্কার। প্রেমিকের নিষ্ঠাহীনতাকে যেন বিদ্রুপ করছে সমাপ্তিকা, আর ভাইকে যেন তিস্কার করছে ছোট বোন রাবেয়া।

অকস্মাৎ দারুণ ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে অভিমন্যু, বেরিয়ে যান—এখনই বেরিয়ে যান এখান থেকে। নইলে—নইলে—। অভিমন্যুর কণ্ঠস্বরে গম্ গম্ করে ওঠে গুহার অভ্যন্তর। থমকে দাঁড়ায় জিনা।

—যান বেরিয়ে বলছি, নইলে—। গুহার এককোণ থেকে একখানা বড় পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয় অভিমন্যু।

একটা বিকৃত হাসি ফুটে ওঠে জিনার মুখে। হঠাৎ সে পাগলের মত খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই সে বলতে থাকে, বেরিয়ে যাবো ? হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবো। এই তো যাচ্ছি। পাথরটা ফেলে দিন হাত থেকে। বেরিয়েই যাচ্ছি আমি।

ভূলুণ্ঠিত স্কার্টটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ায় জিনা। তারপর আর একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় গুহা ছেড়ে।

অভিমন্যু কেবল ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাইরের ঘন অন্ধকারের দিকে।

শেষরাতে বাইরে একটা কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে যায় অভিমন্যুর। গুহার মুখের চাপা পাথরখানা বাইরে থেকে কেমন করে যেন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর, গুহামুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ কমিশনার ডোরোথি। সঙ্গে সেই রাতের অভিসারিকা জিনা।

॥ চৌদ্দ ॥

গোটা প্রমীলা রাজ্যেই দারুণ উত্তেজনা। অফিস-কাছারীতে কেবল একটিমাত্র বিষয়েই তর্ক-বিতর্ক—ফাঁসির আসামী সেই পুরুষটা আবার ধরা পড়েছে, এবার আর ওর নিস্তার নেই। ঘোরতর পুরুষ-বিদ্বেষীদের মুখে স্বস্তির হাসি—যাক্ এবার আপদ বিদেয় হবে। একদলের কণ্ঠে আবার সহানুভূতির সুর—একটা সুন্দর মানুষকে মেরা ফেলার মধ্যে এমন কি কৃতিত্ব থাকতে পারে?

রাস্তাঘাটে পার্কে চায়ের দোকানে কেবল ঐ একটিমাত্রই আলোচনা। স্কুল-কলেজে সমবয়সীদের মধ্যে তর্কের ঝড়—দেখিস্, হাইকোর্টেও এবার ওর মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে।

—কিন্তু সেটা ঘোরতর অন্যায় হবে।

আর একদলের জবাব, কেন অন্যায় হবে? দেশের আইন-ই এই।

—হোক্ দেশের আইন্, তাই বলে এমন একটি সুন্দর মানুষকে মেরে ফেলতে হবে?

—তুই যে দেখছি প্রেমে পড়ে গেলি!

—যা-যা, বেশি কথা বলিস্ না, কার মনে যে কী হচ্ছে তা' আর জানতে বাকি নেই। মুখে যে যতই বড়াই করুক, ঐ লোকটার কাছে যেতে, ওর সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগ পেলে অনেকেই নিজেকে ধন্য মনে করবে।

বাড়িতেও সমবয়সীরা নিভৃতে আলোচনা করে—শুনেছি লোকটা নাকি দেখতে ভারি সুন্দর।

—হ্যাঁ, চোখ ফেরানো যায় না নাকি।

—শুনিস্ নি, দ্বিতীয়বার ধরা পড়ার পরে ওকে দেখতে আদালতের সামনে নাকি এমন ভিড় হয়েছিল যে সেই ভিড় সামলাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছিল ?

—তাই নাকি ? সোজাসুজি একেবারে লাঠি চার্জ ?

—তা'ছাড়া পুলিশের আর উপায় কি ? সেবার তো ভিড়ের জন্যেই লোকটা পালাতে পেরেছিল।

—ওর একার চেষ্টায় তো আর পালাতে পারে নি। ওদের দলে আরও লোক ছিল নিশ্চয়। তাদের বোধহয় পুলিশ আজও খুঁজে পায় নি।

—পেলেও জনসাধারণকে জানতে দেয় নি।

—আচ্ছা, হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখলে তো লোকটির বাঁচার আর কোন রাস্তাই থাকবে না, তাই না ?

—হ্যাঁ, তবে একবার গভর্ণরের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে পারে।

—ওরে বাবা, সে তো শুনেছি ভয়ানক কঠিন ঠাঁই। গভর্ণর সমাপ্তিকার মত পুরুষ-বিদ্বেষী মহিলা তো এই রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি নেই।

বোধহয় সমস্ত রাজ্যে একটিমাত্র নারীই কোন আগ্রহ দেখায় নি এই ব্যাপারে। সে হচ্ছে অর্ধ-উন্মাদ স্বাগতা। খবরটা সেও শুনেছিল। সামান্য একটু কৌতূহল ছাড়া আর কোন উৎসাহই সে দেখায় নি। তার সারা মন অধিকার করে বসেছিল

অভিমন্যু—ম্যাস্‌কিউলিনা ম্যাগাজিনের সেই ছবির অভিমন্যু। তাকে নিয়েই সে দিনরাত মশগুল। মনের চিত্রশালায় সংগৃহীত সেই ছবিটিই তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে প্রায় উন্মাদ করে তুলেছিল।

অন্যের মুখে লোকটির রূপের ব্যাখ্যাও শুনেছিল স্বাগতা। কিন্তু তার নামটি জানতে পারে নি। ধরা পড়ার পর নিজের নাম কোথাও প্রকাশ করে নি অভিমন্যু। এমনকি সেই পঞ্চ-কন্যার দলটির কাছেও নয়।

পরের দিনই কিন্তু খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়লো সারা সহরে। হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে।

ফাঁসির দিন স্থির হলো দু'টো দিন পরে। বেলা দশটায় জেলের মধ্যে ফাঁসি হবে তার। তবে, তার দু'ঘন্টা আগে, বেলা আটটায় স্বয়ং গভর্ণরের সামনে উপস্থিত হয়ে প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করার আবেদন অভিমন্যুকে মঞ্জুর করলো হাইকোর্ট। গভর্ণর তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে ভালই, নইলে ঠিক্ বেলা দশটায় তার ফাঁসি।

রাস্তার দু'পাশে রাজ্যের অধিবাসিনীদের ভিড়। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা তাদের। এই রাস্তা দিয়েই নিয়ে যাওয়া হবে অভিমন্যুকে—সম্ভবতঃ এই তার শেষযাত্রা। অমন সুন্দর যুবাপুরুষটিকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করতে হবে এক বিচিত্র দেশের বিচিত্র আইনের সম্মান।

শুধু রাস্তায় নয়, রাস্তার দু'পাশের বাড়ির দরজায়, জানালায়, বারান্দায়ও নারীর ভিড়। ছয় থেকে ষাট পর্যন্ত সমস্ত বয়সের মেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সেখানে। কৌতূহল আর উৎকণ্ঠার মিশ্রভাবে চঞ্চল তাদের চোখের দৃষ্টি। ভাবলেশহীন মুখে স্বাগতাও এসে দাঁড়িয়েছে তাদের বাড়ির বারান্দায়। কোন ফাঁসির আসামী নয়, যেন কোন দেশবরেণ্য নেতাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে রাজ্যের অধিবাসিনীরা।

একখানা খোলা পুলিশভ্যানের মধ্যে শৃঙ্খলিত অভিমন্যু। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে নারী পুলিশবাহিনী। হাতে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র।

পরনে মলিন পাজামা, গায়ে ময়লা পাঞ্জাবী, উস্কোখুস্কো মাথার চুল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অদ্ভুতরকম শান্ত অভিমন্যুর।

হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে শুনেও কোনরকম চাঞ্চল্য দেখায় নি অভিমন্যু। এমন যে হবে তা' সে জানতো। বরং এর অন্যথা হলেই সে বোধহয় বিস্মিত হতো।

পুলিশ কমিশনার ডোরোথি সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে অভিমন্যুকে বলেছিল, আমরা আগেই ধারণা করেছিলাম যে এমনিই হবে। সোজা কথা তো নয় দু'দুটো চার্জ আপনার বিরুদ্ধে—বিচারাধীন আসামী কাজলকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা, আর তার চাইতেও বড় চার্জ, পুরুষ হয়ে এই নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশ করা। তার ওপর আপনার জেল-গেট থেকে পালানোর ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই হাইকোর্টের জজকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

কোন জবাব না দিয়ে কেবল ম্লান মুখে একটু হেসেছিল অভিমন্যু।

—তা' এখন কি করবেন, ভেবেছেন? ডোরোথি প্রশ্ন করেছিল।

—গভর্ণরের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবো। হাইকোর্ট সে অনুমতি আমাকে দিয়েছে। শান্তকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল অভিমন্যু।

ম্লানকণ্ঠে আবার বলেছিল ডোরোথি, তা, চেয়ে দেখুন। তবে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না।

পুলিশ কমিশনার ডোরোথির কণ্ঠে এই সহানুভূতির সুর কিন্তু কৃত্রিম নয়। পুলিশ অফিসার হলেও সে নারী। অভিমন্যু তার দেশের গোটা পুলিশ বাহিনীকে যে রকম ভুগিয়েছে তাতে তার ওপর ডোরোথির ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু কেন যেন সে তা' হতে পারছে না। প্রচণ্ড পুরুষ-বিদ্বেষী সে কোন কালেই নয়। কিন্তু মুখে তা' প্রকাশ করবার উপায় নেই। দেশের আইনকে সম্মান দেখিয়ে বাইরে পুরুষ-বিদ্বেষ ভাবটিকে সর্বদাই বজায় রাখতে হয় তাকে।

আদালতে মামলার ব্যাপারে অভিমন্যুর সবচেয়ে সান্নিধ্যে আসতে হয়েছিল এই পুলিশ কমিশনার ডোরোথিকে। বয়সে সে অভিমন্যুর

চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু মানুষের কামনা-বাসনা সবসময় বয়সের পার্থক্য বুঝে চলে না। এক একসময় তার মনে হয়েছিল, ঐ সুন্দর যুবাপুরুষটির কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েও যেন কত সুখ—কত আনন্দ! আত্মলুপ্তির মধ্যেই যেন কত তৃপ্তি! কিন্তু নিজের পদাধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিল ডোরোথি। তাই সামান্য একটু মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই সে প্রকাশ করে নি অভিমন্যুর কাছে।

সাধারণ পুলিশ কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে মুখ টিপে হাসাহাসি করত—আমাদের পুলিশ কমিশনার বড্ড বেশি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছেন এই লোকটি সম্পর্কে, তাই না? পাছে আমরা কাজে অবহেলা করি তাই তিনি নিজেই ওকে পাহারা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দেখছিস্ না, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আমাদের কাউকে ওর কাছে ঘেঁসতেই দেন না!

বেলা ঠিক দশটায় অভিমন্যুর ফাঁসি, তার ঠিক দু'ঘণ্টা আগে তাকে হাজির হতে হবে স্বয়ং গভর্ণরের সামনে। জীবন রক্ষার এই শেষ সুযোগ তার। গভর্ণর যদি তার ফাঁসি মুকুব করে তো ভালো, নইলে আর কোন পথ নেই। প্রমীলা রাজ্যের মাটিতেই তাকে ত্যাগ করতে হবে শেষ নিঃশ্বাস। আত্মীয়-পরিজন কেউ পাবে না কোন খবর। কেউ জানবে না তাদের অভিমন্যু চিরকালের মত কোথায় হারিয়ে গেল।

অভিমন্যুর নিজের মুখে কিন্তু তেমন একটা দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে নি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে যেন ভয়-ডর হীন। তবে কি সে জানে যে সমাপ্তিকার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ালে সমাপ্তিকা তার মৃত্যুদণ্ড মুকুব করে দেবেই? তবে কি সে বুঝতে পেরেছে যে সমাপ্তিকা যতই কেন না পুরুষ-বিদ্বেষী হোক, অভিমন্যুর মুখের পানে একবার তাকালে তার সেই বিদ্বেষ কর্পূরের মত উবে যাবেই! সমাপ্তিকার ওপর এতই কি বিশ্বাস অভিমন্যুর?

বোধহয় না। সমাপ্তিকার ওপর সম্ভবতঃ এতখানি ভরসা করতে পারে না অভিমন্যু। ভালোবাসার আলোকে সে পারবে না তার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটাতে। কিন্তু তাতেও দুঃখ নেই তার। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে এই প্রমীলা রাজ্যে এসেছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে তার। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে একবার অন্ততঃ দেখতে পাবে তাকে। তৃপ্ত হবে তার মন-প্রাণ। সেই তৃপ্তি নিয়েই সে চলে যাবে জীবনের পরপারে। সেখানে সে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করবে সমাপ্তিকার জন্যে। এক জন্মে না হোক্, জন্ম-জন্মান্তরে সে নিশ্চয়ই পাবে তাকে।

অভিমন্যুকে নিয়ে খোলা গাড়ি এগিয়ে চলেছে গভর্ণর হাউসের দিকে। দু'পাশের দর্শকদের মধ্যে সামান্য একটু চাঞ্চল্য, হয়ত বা একটু উত্তেজনাও। কিন্তু একেবারেই মৌন তারা। কেমন যেন একটা বিদায়ের করুণ সুর ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। প্রমীলা রাজ্যের অধিবাসীরা শেষ বিদায় জানাতে সমবেত হয়েছে তাদের দেশের একমাত্র পুরুষ অতিথিকে।

অভিমন্যুকে দেখবার জন্যে রাস্তার দু'পাশে, বাড়ির ছাদে, জানালায় মেয়েদের ভিড়। কৌতূহলী সেই অর্দ্ধ-উন্মাদ স্বাগতাও এসে দাঁড়িয়েছে এই লোকটিকে দেখতে।

হঠাৎ গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা স্বাগতার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। গাড়ির মধ্যে বসে থাকা পুরুষটির মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিহ্বল হয়ে ওঠে সে। এ-কে? —এ-কে? এও কি সম্ভব! সে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছে?

কিন্তু স্বপ্ন তো নয়। ঐ তো পুলিশ ভ্যানের মধ্যে স্থির হয়ে বসে রয়েছে তার কল্পলোকের সাথী, যাকে নিয়ে সে একা বিচরণ করে এক স্বপ্নময় জগতে। ঐ তো সেই অভিমন্যু। তার ছবির অভিমন্যু নয়—রক্তমাংসে গড়া বাস্তবের অভিমন্যু।

অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে স্বাগতা। বিস্মিত সুলোচনা ডাকে, একি, কোথায় যাচ্ছিস্ এমনিভাবে?

কিন্তু জবাব দেবার সময় নেই স্বাগতার। এক্ষুণি এসে পড়বে গাড়িটা তাদের বাড়ির সামনে। ওকে বাঁচাতেই হবে—যে করেই হোক্ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতেই হবে ওকে। নইলে সেও বাঁচবে না।

গাড়িটা তত্‌ক্ষণে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। কী করবে জানে না স্বাগতা। কী করতে যাচ্ছে তাও জানে না।

দু'হাতে পাগলের মত ভিড় ঠেলে সামনে এসে হাজির হয় স্বাগতা। তারপর হঠাৎ দু'হাত প্রসারিত করে বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে রাজপথের ওপর এসে দাঁড়ায়।

সতর্ক মহিলা পুলিশ ড্রাইভার আচম্‌কা ব্রেক্ কষে গাড়ির। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে আরোহীরা।

রক্তবর্ণ মুখে গাড়ি থেকে নেমে আসে পুলিশ কমিশনার ডোরোথি। স্বাগতার একটা হাত শক্ত মুঠোর চেপে ধরে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে, কে তুমি? কী চাও?

কিন্তু স্বাগতার তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। সে এক ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে অভিমন্যুর কাছে এসে তার শৃঙ্খলিত হাতটা চেপে ধরে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে, না-না—না, তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না, অভিমন্যু—কিছুতেই মরতে দেব না তোমাকে।

বাক্যহারা অভিমন্যু। বিস্মিত দর্শকেরা। অভিমন্যু একবার ম্লান মুখে তাকায় স্বাগতার মুখের দিকে। মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার শান্ত হয়ে আসে। কে এই নারী! কে এই শুভাকাঙ্ক্ষিণী? কী চায় ও? এই রাজ্যে এসে নিজের নাম তো সে কখনও কাউকে বলে নি। তা'হলে তার নামটাই বা এই মেয়েটি জানল কেমন করে?

স্বাগতার হাতখানা থর থর করে কাঁপছে। সেই কম্পিত হাতে সে তখনও ধরে রেখেছে অভিমন্যুর শৃঙ্খলিত হাতটা। কান্নাভাঙ্গা গলায় সে তখনও বলে চলেছে, এস তুমি, নেমে এস আমার সঙ্গে।.. জীবন.

দিয়ে তোমাকে বাঁচাব আমি। কারুর সাধ্য নেই তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। কারুর—

মুখের কথা কিন্তু মুখেই থেকে যায় স্বাগতার। একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে তাকে সরিয়ে দেয় পুলিশ কমিশনার ডোরোথি। রাস্তার পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় স্বাগতা। আবার চলতে শুরু করে পুলিশ ভ্যান্‌।

স্বাগতা তখনও রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। যেতে যেতে অভিমন্যু একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সেই দিকে। তার শান্ত চোখে ভেসে ওঠে একটা বিষাদের স্পষ্ট ছায়া।

আটটা বেজে দশ মিনিট।

গভর্ণর হাউসের প্রশস্ত হলঘরের মধ্যে চোখ তুলে তাকায় গভর্ণর সমাপ্তিকা। অকস্মাৎ চম্‌কে ওঠে সে। অভিমন্যু! অভিমন্যু এখানে কেন? তা'হলে যে লোকটিকে নিয়ে তার দেশে এতসব কাণ্ড ঘটে চলেছে সে এই অভিমন্যু? কিন্তু এ'তো ছিল তার স্বপ্নেরও অতীত।

সমাপ্তিকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল অভিমন্যু। চোখের পলক পড়ছিল না তার। দৃষ্টিতে ছিল না কোন আবেগের উন্মাদনা। তার শান্ত সমাহিত মুখের ওপর কেমন যেন এক অনৈসর্গিক তৃপ্তির ছায়া। তার সারা অবয়বে একটা গভীর প্রশান্তি। আর কোন খেদ নেই তার। যা' সে চেয়েছিল তা' পেয়েছে। তার মানসী প্রতিমাকে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিল অভিমন্যু। জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিল সেই জন্যে। সেই ইচ্ছা এতক্ষণে পূর্ণ হয়েছে তার।

গভর্ণর সমাপ্তিকার মনোজগতে কিন্তু তখন প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব। সামনে ঐ দাঁড়িয়ে অভিমন্যু। সে প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছে তার কাছে। তার মুখের একটিমাত্র শব্দ কিম্বা তার কলমের একটিমাত্র আঁচড়েই এই পৃথিবী থেকে সে নিঃশেষে মুছে দিতে পারে ঐ লোকটিকে। কিন্তু—

নিজের চঞ্চল মনটাকে কঠিন প্রয়াসে সংযত করতে চেষ্টা করে সমাপ্তিকা। অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিতেই হবে। কোন মায়া নেই, কোন দয়া নেই। ঐ পুরুষটি দেশের আইন অমান্য করে প্রবেশ

করেছে এই নিষিদ্ধ রাজ্যে। এর চাইতে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? সেখানে কোন্ যুক্তিতে সে দয়া করবে তাকে? কিন্তু—

না—না। আর কোন কিন্তু নয়। সমাপ্তিকা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে ঐ অভিমন্যু সত্যিই সুপুরুষ, ওর মায়াময় দৃষ্টির আকর্ষণ দুর্লঙ্ঘনীয়। কিন্তু তাই বলে অলঙ্ঘনীয় নয় কিছুতেই। ঐ অভিমন্যু এককালে তার মনের এক কোণে সামান্য একটু জায়গা করে নিতে সমর্থ হলেও তাকে সে মোটেই ভালবাসে না। না—না, ওর প্রতি ভালবাসার চিহ্নমাত্র নেই তার মনে। প্রমীলা রাজ্যের গভর্ণর হয়ে সে কেমন করে ভালবাসতে পারে একজন যুবককে?

কিন্তু, তার মনোজগতের এই আলোড়ন টের পেল নাকি কেউ? সমাপ্তিকা একমুহূর্ত তাকায় অভিমন্যুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কমিশনার ডোরোথির মুখের দিকে। ভাবলেশহীন সেই মুখ। তারপর ফিরে চায় তার প্রাইভেট সেক্রেটারী মাধবীর মুখের পানে। না, সেখানেও কোন সন্দেহের ছায়া নেই। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় সমাপ্তিকা। তারপর আবার সোজা তাকায় অভিমন্যুর দিকে। অকম্পিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে তাকে, আপনি এ দেশের আইন ভঙ্গ করে কেন প্রবেশ করেছেন এই রাজ্যে?

চোখের পাতা নড়ে ওঠে অভিমন্যুর। ঠোঁট দু'টো ফাঁক হয় একটু। তারপর ধীর শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, তোমাকে দেখবার জন্যে।

কথাটা কানে যেতেই আবার বিহ্বল হয়ে পড়ে সমাপ্তিকা। তার পরিচিত—অতি পরিচিত এই পুরুষ কণ্ঠস্বর। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায় সে। ভুলে যায়, অভিমন্যুর এই জবাবে উপস্থিত পুলিশ কমিশনার কিম্বা তার প্রাইভেট সেক্রেটারী কিছু মনে করতে পারে।

স্খলিতকণ্ঠে সে আবার বলে ওঠে, কিন্তু তুমি কি জানতে না এই দেশে প্রবেশ করার অপরাধে তোমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে?

এবার সামান্য একটু হাসি ফুটে ওঠে অভিমন্যুর ঠোঁটের কোণে।

জবাব দেয় সে, জানতাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানতাম যে তোমাকে অন্ততঃ একটিবার দেখার সুযোগ পাবো।

মেঘমুক্ত নীল আকাশের দিকে নজর পড়েছে বিহঙ্গের। ডানা মেলে উড়তে ইচ্ছে করছে ঐ খোলা আকাশে। সেখানে মেঘের ঘনঘটা। পেখম মেলে নাচতে ইচ্ছে করছে ময়ূরের। ভাববিভোর সমাপ্তিকা চঞ্চল হয়ে ওঠে। উদ্বেল হয়ে ওঠে মনটা। কিন্তু তবুও প্রাণপণ শক্তিতে সেই হৃদয়াবেগ সংযত করতে গিয়ে সে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে। পুলিশ কমিশনার ডোরোথিব দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, এখানে আসতে দশ মিনিট দেরি করেছেন, নয় কি?

এক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ডোরোথি। তারপর মাথা নীচু করে একটু লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দেয়, আজ্ঞে হ্যাঁ, রাস্তায় একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।

উৎসুক কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে সমাপ্তিকা, তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটি মেয়ে হঠাৎ গাড়ির সামনে দৌড়ে এসে আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বন্দীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। বলেই অভিমন্যুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার সোজা সমাপ্তিকার দিকে তাকায় ডোরোথি।

অকস্মাৎ ভ্রূ-যুগল কুঁচকে ওঠে সমাপ্তিকার। কঠিন কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে, কে সেই দুঃসাহসী? তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি?

পুলিশ কমিশনার ডোরোথি জবাব দেবার আগেই সমাপ্তিকার প্রাইভেট সেক্রেটারী মাধবী বললে, ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি টেলিফোনে খবর নিয়েছি। মেয়েটির নাম স্বাগতা। একবছর আগে ম্যাস্কিউলিনা নামে একটা নিষিদ্ধ ম্যাগাজিন রাখার অপরাধে আপনি ওর-ই ছ'মাসের দণ্ডাদেশ বাড়িয়ে এক বছর করেছিলেন।

মুহূর্তে মুখ-ভাবের একটা দারুণ পরিবর্তন ঘটে সমাপ্তিকার। এতক্ষণে তার চোখের শান্ত দৃষ্টি অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। মনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করে একটা তীব্র জ্বালা। এই জ্বালার ব্যাখ্যা জানে না

সমাপ্তিকা। এ' সেই জ্বালা, যে জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে নারী তার প্রেমাস্পদকে স্বয়ং যমের হাতে তুলে দিতে পারে, কিন্তু তবুও পারে না অন্য কোন নারীর হাতে ছেড়ে দিতে। 'এ' সেই জ্বালা, যে জ্বালায় নারীর কল্যাণময়ী রূপের মধ্যে জেগে ওঠে এক ভয়ঙ্করী রুদ্ররূপ, ফুলের মত কোমল মন শক্ত পাথরের মত কঠিন হয়ে ওঠে।

দাবদাহের মত জ্বালার সেই প্রচণ্ড দাহ মুহূর্তে গ্রাস করে সমাপ্তিকার সারা মনটাকে। তার থমথমে গম্ভীর মুখখানা রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি একটা জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সেবার সে বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই মেয়েটার দণ্ড। কিন্তু এবার এই মুহূর্তে সেই মেয়েটাব বদলে তার সমস্ত ক্রোধ এসে জমা হয় এই অভিমন্যুর ওপর।

অকস্মাৎ সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শাণিত দৃষ্টিতে তাকায় অভিমন্যুর মুখের পানে। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, আমার কাছে ক্ষমা নেই। মৃত্যুদণ্ডই বহাল রইলো।

বলেই ঝড়ের বেগে নিজের প্রাইভেট চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায় সমাপ্তিকা। আর ঠিক্ তেমনি শান্ত নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ফাঁসির আসামী অভিমন্যু।

জেলের প্রধান ফটকের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। দলে দলে মহিলারা এসেছে সর্বশেষ সংবাদ সংগ্রহের আশায়। চোখে-মুখে সুস্পষ্ট উৎকণ্ঠার ছাপ্ তাদের। সকলের দৃষ্টিই এক জায়গায় নিবদ্ধ—জেলের প্রধান ফটকের চূড়োয়, যেখানে পত্ পত্ করে উড়ছিল রাজ্যের জাতীয় পতাকা।

ঐ পতাকাই হচ্ছে সঙ্কেত। অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরেই মৃতের আত্মার প্রতি সম্মান দেখাতে ঐ জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে বিউগলের বিদায়ের সুর।

গভর্ণর হাউসের দোতলায় একা দাঁড়িয়ে আরও একটি নারী। তার চোখের দৃষ্টিও নিবদ্ধ জেলের ফটকে ঐ জাতীয় পতাকার দিকে।

এক একবার মনে হয় সমাপ্তিকার, পতাকাটা বোধহয় ঐ নেমে এল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের চোখের ভুল বুঝতে পারে। নামছে

না, উড়ছে—হাওয়ায় উড়ছে। কান পেতে স্থির হয়ে গভর্ণর হাউসের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ঐ বোধহয় বেজে উঠল বিউগলের বিদায়ের সুর—মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন।

অভিমন্যু মরবে—মরতে হবে তাকে। আইনের চোখে সে অপরাধী। কিন্তু কী এমন অন্যায় করেছিল সে? তাকে ভালবেসেছিল। সেই ভালবাসার টানেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে ছুটে এসেছিল এই রাজ্যে। তবে কি ভালবাসা অপরাধ! সত্যিই কি তাকে ভালবাসে অভিমন্যু! হয়ত বাসে। কিন্তু—কিন্তু—

না—না। এসব অন্যায় হৃদয়াবেগকে মোটেই প্রশ্রয় দেবে না সমাপ্তিকা। সে নিজে ভালবাসে না অভিমন্যুকে। না—না, মোটেই ভালবাসে না। গভর্ণর সমাপ্তিকার পক্ষে কোন পুরুষকেই ভালবাসা সম্ভব নয়। নর-বিদ্বেষী স্ত্রী জাতির প্রতিনিধি সে। এদেশে কোন পুরুষেরই স্থান নেই—এদেশের কোন নারীর মনেও স্থান পাবে না কোন পুরুষ।

নিজের ছোট্ট হাতঘড়িটির দিকে তাকায় গভর্ণর সমাপ্তিকা। দশটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। আর মাত্র পাঁচ মিনিট এই পৃথিবীতে বেঁচে আছে অভিমন্যু। তারপরেই—

এতক্ষণে বোধহয় জেলের মধ্যে ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। ওর মুখে কি কোন ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে এতক্ষণে? কোন রকম অনুশোচনা? এই মুহূর্তে অভিমন্যু মনে মনে কী ভাবছে? কার কথা ভাবছে? সমাপ্তিকার কথা? না, সেই স্বাগতার কথা?

স্বাগতা—স্বাগতা—স্বাগতা। মেয়েটাকে ছু'হাতে তুলে নিয়ে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে করে সমাপ্তিকার। ইচ্ছে হয়, মেয়েটাকে সারাজীবন জেলে পুরে রাখতে। এতবড় সাহস ওর! গাড়ি থামিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে কেড়ে নিতে চায়?

ওই মেয়েটা কি সত্যি ভালবাসে অভিমন্যুকে? তা' বাসুক না, একশ'বার ভালবাসুক। তাতে সমাপ্তিকার কি যায় আসে? অভিমন্যু সমাপ্তিকার কে? কেউ না—কেউ না।

দশটা বাজতে আর মাত্র দু'মিনিট বাকি। আচ্ছা, এই সময় যদি ইলেক্‌ট্রিক ফেল করে? যদি কোন কারণে পাওয়ার হাউসের যন্ত্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়? যদি কোন কারণে ইলেক্‌ট্রিক সুইচে কোন গোলযোগ দেখা দিয়ে ফাঁসি কাঠের লিভারটা অচল হয়ে পড়ে, আর সেই বিগড়ে যাওয়া লিভারটা যদি আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেও মেরামত করা না যায়? দেশের আইন সেক্ষেত্রে কী বলে? সময় পার হয়ে গেলে কি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা চলে?

হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক শক্‌ খাওয়া মানুষের মত দারুণ চমকে ওঠে সমাপ্তিকা। দূরে ভেসে ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলো বিউগলের বিদায়ের সুর। জাতীয় পতাকা ধীরে ধীরে নেমে আসে জেলখানার চূড়োয়।

মাঝপথে নেমে এসে পতাকাটা পত্‌ পত্‌ করে হাওয়ায় উড়তে থাকে। একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে সমাপ্তিকা। ওটা যেন পতাকা নয়—কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু কাকে ডাকছে —কেন ডাকছে?

তখনও থেমে যায় নি বিউগলের বিদায় সুর। কেঁপে কেঁপে বেজে চলছে। এবার হয়ত শেষ হবে।

চোখের কোণ দুটো হঠাৎ অস্বাভাবিক জ্বালা করে ওঠে সমাপ্তিকার। অভিমন্যু আর নেই। এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে সে চলে গেছে অন্য কোন এক রাজ্যে। সেখানে হয়ত—

না—না। এসব কী ভাবছে সে? সে না এই প্রমীলা রাজ্যের গভর্ণর? তার আদর্শেই না চলবে এখানকার অধিবাসীরা? তবে সে নিজে এত দুর্বল হয়ে পড়ছে কেন?

ওপরের দাঁতের পাটি দিয়ে নীচের ঠোঁটের একটা কোণ চেপে ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে সমাপ্তিকা। ঐ অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্যে সে নিজেই দায়ী। ইচ্ছে করলে তাকে সে ক্ষমাও করতে পারতো। কিন্তু তা' সে করে নি।

ওকে ক্ষমা না করে ঠিক কাজই করেছে সমাপ্তিকা। রক্ষা করেছে নিজেকে। রক্ষা করেছে আইনের সম্মান।

কিন্তু এই মুহূর্তে তার চোখের কোণে জল জমা হয়েছে কেন? সেও কি তবে ভালোবাসতো অভিমন্যুকে? না—না, অভিমন্যু তার কেউ ছিল না। সে শ্রেষ্ঠ বিচার করতে পেরেছিল বলেই অপরাধীর মনের দুঃখ তার নিজের মনেও বেজেছে। তাই তার চোখে এই জল। এ ছাড়া আর কিছু নয়। অভিমন্যুকে সে ভালোবাসতো না কোনদিন।

বিদেশী কবির সেই বিখ্যাত লাইন কয়টি মনে মনে আবৃত্তি করে সমাপ্তিকা—

দণ্ডিতের সাথে,
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে,
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠ বিচারই সে করেছে। ক্ষমা করে নি সে অপরাধীকে। কোন ওজুহাতেই অভিমন্যুর অপরাধকে লঘু করে দেখে নি সমাপ্তিকা।

॥ পনের ॥

নিজেকে ঠকিয়েছে গভর্ণর সমাপ্তিকা। দারুণভাবে ঠকিয়েছে। শ্রেষ্ঠ বিচার সে মোটেই করে নি—করতে পারে নি। ওটা কেবল তার মনের সান্ত্বনা। অপরাধীকে দণ্ডবিধান করে দণ্ডিতের দুঃখে সে মোটেই কাঁদে নি। কেঁদেছে অন্য কারণে। সেই ছোট্ট মিঠুর ব্যাপারেও যা' ঘটেছিল, এই অভিমন্যুর বেলাও ঠিক্ তাই হয়েছে। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শ্রেষ্ঠ বিচার একে বলা চলে না।

অদ্ভুত মানসিক শক্তির অধিকারিণী সমাপ্তিকা। এই ক'দিনেই নিজেকে বেশ সামলে নিয়েছে সে—অন্ততঃ তার বাইরের আচার-আচরণে কোনরকম বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারে নি কেউ। তবে কেমন যেন একটু বেশি শান্ত—একটু বেশি সংযত।

প্রমীলা-রাজ্যের নর-বিদ্বেষী নারী গভর্ণর সমাপ্তিকা। রাজ্যের অধিবাসিনীরা যাতে পুরুষের চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজেদের মন কলুষিত না করে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি তার। এ'বিষয়ে তার নিজের আচার-আচরণের মূল্য অনেকখানি। আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়—নিজের আচার-আচরণকে যদি সে সংযত রাখতে না পারে তবে অন্যের কাছ থেকে তেমন আচরণ সে আশা করতে পারে কী করে? কেনই বা দেশের তাবৎ জনসাধারণ তাকে মানবে? কেনই বা তারা তাকে দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রাখবে?

প্রচণ্ড শক্তিবলে নিজের মনটাকে শক্ত করে সমাপ্তিকা। সেই ছোট্ট মিঠুকে সে ভালবাসত। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে তাকে দেশ থেকে বিদায় দিতে হয়েছে। অভিমন্যুকে—অভিমন্যুকেও সে ভাল—

না—না, মোটেই ভালবাসত না তাকে। কিন্তু পুরুষ হলেও সে ছিল একজন মানুষ। উন্মত্ত যৌবনের প্রতীক এক সুন্দর যুবাপুরুষ। অসময়ে তার জীবনের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতেও এতটুকু দ্বিধা করে নি সমাপ্তিকা। তার পুরুষ-বিদ্বেষের এটাই বোধহয় চরম নিদর্শন। রাজ্যের জনসাধারণ এতদিনে নিশ্চয়ই অভিমন্যুর সঙ্গে তার সেই অতীতের সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছে। কিন্তু তাতে মোটেই লজ্জা নেই সমাপ্তিকার। অতীতের সেই সম্পর্ককে সরাসরি অস্বীকার করে নির্মমভাবে তাকে সে চরম শাস্তি দিয়েছে। এতেই সে একটা আদর্শ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তাদের সামনে—এটাই তার চরম তৃপ্তি।

কিন্তু যুক্তির পদচিহ্ন অনুসরণ করে সবসময় মানুষের মন চলে না। যুক্তি যতই দৃঢ় হোক না কেন, মানুষের মন সবসময় তার তোয়াক্কা করে না। তাই নিজের মনে যতই কেন না যুক্তির জাল বুনে চলে সমাপ্তিকা, মনোজগতের এক গভীর তলদেশে কেমন যেন একটা অতি সূক্ষ্ম বেদনাবোধ মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তার সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। কিন্তু হুঁসিয়ার সমাপ্তিকা। কঠিন আত্মশাসনে সেই ব্যাপ্তি রোধ করে রাখে সে।

মাসের পর মাস কাটে। গভর্ণর সমাপ্তিকার মনটা আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর। সমগ্র প্রমীলা-রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত। এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই কোথাও। সেই অবাধ্য মেয়েটা—স্বাগতাকে সে কঠিন শাস্তি দিয়েছে। দশবছর জেল হয়েছে তার। রাজ্যের যুবতীরা সাবধান হয়ে গেছে। পুরুষ সম্বন্ধে অযথা কৌতূহল প্রকাশ কিম্বা তাদের সম্বন্ধে গোপন চিন্তা করতে আর সাহসী হবে না তারা। প্রমীলা রাজ্যের ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? রাজ্যের অধিবাসিনীরা কি সত্যিই সুখী? তাই যদি হবে তবে ওদের মুখে মাঝে মাঝে অমন অতৃপ্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে কেন?

দামী মোটরে চড়ে রাস্তায় যেতে যেতে গভর্ণর সমাপ্তিকা রাজ্যের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছে। রাস্তায় পথচারিনীদের ভিড়। দোকানী খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত। মেয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সওয়ারীর আশায় বসে আছে। শক্ত-সমর্থ হিন্দুস্থানী রিক্সাওয়ালী রিক্সা টেনে নিয়ে চলেছে। রাস্তায় জনস্রোত—স্কুল-কলেজের ছাত্রী, অফিসের কেরাণী, আদালতের মেয়ে উকিল, মুহুরী—সবাই চলেছে নিজ নিজ কাজে। কেউ বসে নেই, কেউ দাঁড়িয়ে নেই। জমজমাট নাগরিক জীবন।

গ্রাম অঞ্চলেও ঘুরেছে সমাপ্তিকা। সেখানেও বসে নেই কেউ। চাষী মেয়েরা নিজেদের হাতে চাষ করছে জমি। ফসল কাটার সময় নিজেরাই ফসল কেটে গোলায় তুলছে। জেলেনীরা মাছ ধরছে নিজেদের হাতে। ব্যবসাক্ষেত্রে, গঞ্জে বিশাল বপু মাড়োয়ারী মহিলারা গদী আগলে বসে রয়েছে।

কিন্তু সর্বত্রই কেমন যেন একটা অতৃপ্তির ছায়া তাদের মুখেচোখে। সব থেকেও যেন কিসের একটা অভাববোধ। কি যেন একটা নেই। কাজ করতে হয়, তাই করছে। তাতে যেন নেই তেমন প্রাণের সাড়া।

কেন এমন হয়? কিসের এই অভাববোধ? নিজের মনেই

প্রশ্ন করেছে সমাপ্তিকা। জবাব পেতেও দেরি হয় নি। কিন্তু সে মনে-প্রাণে যেন বিশ্বাস করতে পারে নি কথাটা। পুরুষহীন নারী জীবনের একঘেয়েমি কিম্বা বৈচিত্র্যের অভাবের প্রতিক্রিয়া এ'সব? প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণের অনিবার্য ফল? স্বভাবতই আর একটা প্রশ্ন মনে এসেছিল সমাপ্তিকাব—পুরুষ জীবনে নারীর উপস্থিতির মত নারী জীবনে পুরুষের উপস্থিতিও কি একান্তই প্রয়োজন? সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছেও কি তাই?

নিষিদ্ধ প্রমীলা-রাজ্যের হতভাগিনী নারী! ওরা জানল না, স্ত্রী-পুরুষের সত্যিকারের সম্পর্ক এই পার্থিব জগতে নিয়ে আসতে পারে কতখানি অপার্থিব আনন্দ। ওরা জানল না, স্ত্রী-পুরুষের সত্যিকারের ভালবাসাই হ'ল সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথা। অবশ্যি বুঝতে পারলেও সেকথা মুখে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল না তাদের। এক বিচিত্র রাজ্যের অধিবাসিনী তারা। এখানে পুরুষের কথা উচ্চারণ করাও পাপ। তাদেব কথা চিন্তা করাও ঘোরতর অপরাধ। যারা তা' করার জন্যে একদিন মাথা তুলতে চেষ্টা করেছিল সেই আনোয়ারা-মিলি-রাবেয়ার দল আজ কারাগারে।

গভর্ণর হাউসের বাগানের মধ্যে একটা সুদৃশ্য বেঞ্চিতে বসে সমাপ্তিকা এই প্রমীলা রাজ্যেব কথাই বসে বসে চিন্তা করছিল।

দূরে পাহাড়ের চূড়োয় অস্তগামী সূর্য। দিনের শেষে বিদায় নেবার আগে সে তার লাল্‌চে আলোর পরশ দিয়ে যাচ্ছিল উঁচু গাছগুলোর মাথায়। গভর্ণর হাউস সংলগ্ন বিরাট বাগান। চারিদিকের উঁচু গাছগুলো সৃষ্টি করেছে এক কৃত্রিম বন্যতা। মাঝখানে রকমারি ফুলের কেয়ারি। মাঝে মাঝে কৃত্রিম জলাধার ও ঝর্ণা।

একটা ছোট ঝোপের পাশে পড়েছিল একটা ভাঙ্গা তিন চাকার সাইকেল। সেদিকে নজর পড়তেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে সমাপ্তিকার। মিঠুর পরিত্যাক্ত সাইকেল ওটা। সেই ছোট্ট সুন্দর মিঠু। সরল নিষ্পাপ শিশু। তার আধো-আধো বুলি যেন এখনও কানে বাজছে সমাপ্তিকার।

মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তার। একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকায় সমাপ্তিকা।

দুটি সুন্দর পাখী বসেছিল একটা ডালে। ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে তারা আদর করছিল একে অন্যকে।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে সমাপ্তিকা। নিজের অজ্ঞাতসারেই হঠাৎ সে বলে ওঠে, বাঃ কী সুন্দর!

অকস্মাৎ পাশের বুড়ো অশ্বত্থ গাছের একটা ডাল ভীষণ জোরে নড়ে ওঠে।

চম্‌কে সেদিকে তাকায় সমাপ্তিকা। একজোড়া হনুমান দম্পতি। স্ত্রী হনুমানটার বুকের সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে একটি ছোট্ট বাচ্চা। স্ত্রী হনুমানটি এসে একটা মোটা ডালে পা ছড়িয়ে বসে। একবার বাচ্চাটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর স্থির হয়ে বসে থেকে কেবল এদিক ওদিক তাকাতে থাকে।

এতক্ষণ মগডালে বসেছিল পুরুষ হনুমানটি। এবার সে ভারিক্কী চালে নীচে নেমে স্ত্রী হনুমানটির ঠিক্ পেছনে এসে বসে। তারপর আদরের ভঙ্গিতে তার মাথায় বারকয়েক হাত বুলিয়ে দিয়ে উকুন বাছতে থাকে। পরম নিশ্চিন্তে বসে থাকে স্ত্রী হনুমানটি বাচ্চাটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। গভীর আবেশে যেন বুজে আসে তার ক্ষুদে চোখদু'টি। বন্য হনুমান দম্পতির একটি ছোট্ট সুন্দর সংসার।

একি হল সমাপ্তিকার! হনুমান দম্পতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন কেমন করে ওঠে মনটা। একটা প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ তার সারা মনটাকে গ্রাস করে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে। ভেঙে যায় সংযমের বাঁধ। টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিঁড়ে পড়ে অনুশাসনের শৃঙ্খল। কেবলই মনে হতে থাকে—কি যেন হারিয়েছি আমি—চিরতরে হারিয়েছি। আর কোনদিন ফিরে পাব না—কোনদিন না—কোনদিন না।

একটা কান্নার ঢেউ অকস্মাৎ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় সমাপ্তিকার বুকের মধ্য থেকে। থর থর করে কাঁপতে থাকে তার সারা দেহ।

একটা সব হারানোর প্রচণ্ড দুঃখ অস্বাভাবিক বেগে উৎসারিত হয় তার মনের মধ্যে। এতদিনে বোধহয় সুপ্ত প্রেমের উদ্বোধন ঘটে তার জীবনে।

সমাপ্তিকা আর বসে থাকতে পারে না বাগানে। হনুমান দম্পতি ঠিক্ তেমনিভাবে বসে রয়েছে সেই অশ্বত্থ গাছটার ডালে। কৃষ্ণচূড়া গাছে সেই নাম-না-জানা সুন্দর পাখী দুটি ঠিক তেমনিভাবে পরস্পরকে আদর করছে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে। ঝোপের পাশে পড়ে রয়েছে ছোট্ট মিঠুর সেই ভাঙা সাইকেলটা।

অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ায় সমাপ্তিকা। তারপর দ্রুতপায়ে একরকম ছুটতে থাকে গভর্ণর হাউসের দিকে, যেন কেউ পেছনে তাড়া করেছে তাকে।

পালাতে চায় সমাপ্তিকা। সহজ, সুন্দর স্বাভাবিকতা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তার মনের মধ্যে। সেই আগুনের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে পালাতে চায় সে। নিজের কাছ থেকেও পালিয়ে বাঁচতে চায়। পরাজিত হয়েছে সে। সম্পূর্ণ পরাজিত—পর্যুদস্ত।

কিন্তু এ'তো পরাজয় নয়। এ যে জয়েরই নামান্তর। অন্ধকার থেকে আলোকের পথে শুরু হয়েছে তার জয়যাত্রা। প্রেমের দীপ্ত মণি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই আলো। এর ছটায় গোটা জগৎ-সংসার যে আলোকিত।

ঝড়ের বেগে নিজের কক্ষে এসে প্রবেশ করে সমাপ্তিকা। চোখদুটো তার রক্তবর্ণ। এখনই হয়ত দু'কূল ছাপিয়ে নেমে আসবে জলের ধারা।

একমুহূর্ত স্থির হয়ে কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে সমাপ্তিকা। তারপর একটা সুদৃশ্য টেবিলের পাশে সরে গিয়ে ড্রয়ার খুলে টেনে বের করে সেই ম্যাস্কিউলিনা ম্যাগাজিনটা।

দু'হাতে অভিমন্যুর ছবিটা চোখের সামনে মেলে ধরে স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। একটা দুঃসহ বেদনা আঘাতের পর আঘাত করে তার হৃদয়-তন্ত্রীকে অসাড় করে ফেলে। বুকটা যেন ভেঙে যায় তার। হঠাৎ সে তার সুদৃশ্য পালঙ্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিমন্যুর ছবিটার ওপর মুখ রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাধাহীন

সেই কান্নার দমকে সমস্ত দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে থাকে তার। চোখের তপ্ত অশ্রুধারায় ভিজে ওঠে অভিমন্যুর সুন্দর ছবিটা।

॥ ষোল ॥

ঘুম ভেঙে যায় সমাপ্তিকার। সমাপ্তি ঘটে স্বপ্নের।

চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজে উঠেছে তার। অবাস্তব এক দীর্ঘ স্বপ্নের বাস্তব পরিণতি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিছানার ওপর উঠে বসে সমাপ্তিকা। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেই থাকে তেমনিভাবে। কেমন যেন ক্লান্ত লাগে নিজেকে।

একী স্বপ্ন দেখল সে? কেনই বা দেখল এমনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন! কীসের ইঙ্গিত এটা?

বাইরে সমুদ্রের একটানা গর্জন। হোটেলেও সাড়াশব্দ নেই কারুর। এত সকালে কেউ হয়ত ঘুম থেকেই ওঠে নি।

ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে নেমে আসে সমাপ্তিকা। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় একবার। গুছিয়ে রাখা জিনিসপত্র জড়ো করে রাখা হয়েছে একপাশে। এখন শুধু বিছানাটা গুটিয়ে নিয়েই সে রওনা দিতে পারে স্টেশনের দিকে।

দেয়ালের পাশে সরে গিয়ে জানালার একটা পাল্লা খুলে দিতেই একঝলক্ কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে। ভালই লাগে তার। তপ্ত চোখমুখ যেন জুড়িয়ে যায় সেই হাওয়ার শীতল স্পর্শে।

সমস্ত দেহমনে একটা ক্লান্তিকর অবসাদ সমাপ্তিকার। সারারাত ধরে সে স্বপ্ন দেখেছে। অতি অদ্ভুত সেই স্বপ্ন। কত ঘটনা—কত চরিত্র। স্বপ্নে দেখা সেই মানুষগুলো একান্তই কাল্পনিক। কেবল একজন ছাড়া, আর সে হচ্ছে অভিমন্যু।

স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন। বাস্তবের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই তার। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ দেখা দিয়েই মরীচিকার মত তা' মিলিয়ে যায়। কেবল মনের মধ্যে রেখে যায় তার রেশ

জানালার গরাদের ওপর মুখ রেখে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে থাকে সমাপ্তিকা। সামনেই কুয়াশা ঢাকা বিরাট সমুদ্র অস্বচ্ছ অস্পষ্ট। কেবল বিরামহীন ঢেউয়ের শব্দ।

অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে একসময় কক্ষসংলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করে সে।

বেসিনে মুখ ধুতে গিয়ে আয়নার ওপর নজর পড়ে তার। চমকে ওঠে সে। একী চেহারা হয়েছে? স্বপ্নের মধ্যে কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে মুখখানা। চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত।

ঘরে প্রবেশ করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে বসে সমাপ্তিকা। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে নিজেকে। কিন্তু কী দেখছে সে? নিজের রূপ? নিজের যৌবন? কিম্বা অন্যকিছু?

আয়নার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখে সমাপ্তিকা। এমনি নিবিষ্টমনে নিজেকে বোধহয় কোনদিন সে দেখে নি। লোকে বলে সে নাকি সত্যিই সুন্দরী। লোকের সেই কথার দাম দেয় নি সে কোনদিন। ভ্রূক্ষেপ করে নি কোন পুরুষের কোন স্তুতি বন্দনায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সেই চিরকালের মনের কাঠামোয় যেন কেমন এক পরিবর্তন এসেছে—একটা আবেশময় মধুর পরিবর্তন।

মনের মধ্যে একটা গোপন চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার। নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে হয়। সমস্ত অবরোধ, অনুশাসন তুলে ফেলে দিয়ে আত্মপ্রকাশের বাসনা জাগে মনে। সে যেন একটি গোলাপের কুঁড়ি। এতদিন পাপড়ির আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসেছিল আত্মগোপন করে। এবার সেই গোলাপী পাপড়ি মেলে নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে তার। নিজেকে মেলে ধরতে সাধ জাগে এমন এক ব্যক্তির কাছে যে তাকে জানবে, তাকে বুঝবে, তাকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে। তাকে—তাকে ভালবাসবে।

মাথাটা আঁচড়ে সামান্য একটু প্রসাধন করে নেয় সমাপ্তিকা। তারপর একসময় এসে দাঁড়ায় অভিমন্যুর কক্ষের সামনে।

একমুহূর্ত স্থির হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সমাপ্তিকা বন্ধ কপাটে মৃদু আঘাত করে।

একবার—দু'বার—তিনবার।

এতক্ষণে ভেতর থেকে ভেসে আসে অভিমন্যুর নিদ্রাজড়িত কণ্ঠস্বর—কে ?

—আমি, দরজা খুলুন।

—এই যে, খুলছি।

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই নিজেকে কোনরকমে প্রস্তুত করে নিয়ে দরজা খুলতে খুলতে লজ্জিতকণ্ঠে বলে ওঠে অভিমন্যু, ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেল উঠতে। তারপর নিজের হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আবার বললে, আপনার ট্রেনের তো সময় হয়ে এল!

কোন জবাব না দিয়ে একটু স্মিত হাসি হাসে সমাপ্তিকা।

অভিমন্যু তাড়া দেয় আবার, শীগ্‌গির চলুন। জিনিসপত্র তো গোছানোই আছে আপনার। স্টেশনে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগবে না।

কিন্তু সমাপ্তিকার চালচলনে প্রকাশ পায় না তেমন কোন ব্যস্ততার লক্ষণ। সে কেবল ব্যঞ্জনাময় গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অভিমন্যুর মুখের দিকে।

নারীর এই দৃষ্টির অর্থ কোন পুরুষকে বলে দিতে হয় না। চম্‌কে ওঠে অভিমন্যু। একটু যেন আশ্চর্য হয়। নিজের চোখদুটোকেও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না সেই মুহূর্তে। একটা বিচিত্র অনুভূতিতে মনটা পূর্ণ হয়ে ওঠে কানায় কানায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে সমাপ্তিকার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে।

ভাব যেখানে গভীর, ভাষা সেখানে স্তব্ধ। শুধুমাত্র চোখের ভাষাই সেখানে ভাষার অতীত এক উপলব্ধি সৃষ্টি করে। সেই উপলব্ধির গভীরতা ও বিস্তারের কাছে ভাষা একান্তই ক্ষুদ্র।

ধ্যানভঙ্গ হয় সমাপ্তিকার। বুকের মধ্যে সপ্তসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। একটা অতীন্দ্রিয় সুখ যেন এতক্ষণ ঘিরে রেখেছিল তাকে। একটা

আত্মবিস্মৃতিকর স্নিগ্ধতা যেন বেষ্টন করে রেখেছিল তার সমগ্র সত্তাকে

লজ্জানম্র কণ্ঠে সমাপ্তিকা কেবল বললে, চল।

অভিভূত অভিমন্যু প্রশ্ন করে, কোথায় ?

—সমুদ্রের পাড়ে। আবেশময় কণ্ঠে জবাব দেয় সমাপ্তিকা।

বাস্তবে ফিরে আসে অভিমন্যু। বললে, কিন্তু তুমি না আ কলকাতায় ফিরবে ?

অভিমন্যু থামতেই সমাপ্তিকা তার বাঁ-হাতের মুঠি খুলে রেখে একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট বের করে। তারপর অভিমন্যু কি বুঝতে পারার আগেই সেখানা তু'হাতে টুক্‌রা টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফে বলে ওঠে, না, যাব না আমি।

—সে কি ? তবে, এখানেই থাকবে ?

—হ্যাঁ।

—কতদিন ?

—যতদিন তুমি থাকবে।

কুয়াশা ঢাকা অশান্ত সমুদ্র। গোটা আকাশটা যেন নীচে নেমে এসে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর।

জল, স্থল, আকাশ একসূত্রে গাঁথা হয়ে একাকার হয়ে উঠেছে তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের বিশেষ গণ্ডি। অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য হয়ে উঠেছে তারা সেই মুহূর্তে।

*   *   *

ভেজা বালির ওপর পায়ের চিহ্ন ফেলে এগিয়ে চলেছে একজোড় নর-নারী। হাতে হাত ধরা তাদের। পাশাপাশি তু'জোড়া পায়ে চিহ্ন যেন এক দৃঢ় বন্ধনের সঙ্কেত। [স্ত্রী ও পুরুষ—নর ও নারী— স্রষ্টার সার্থকতম সৃষ্টির তুই বৈচিত্র্যময় রূপ। কেউ ছোট নয়, কেউ ব নয়। এই বিশ্বসংসারের সমান অংশীদার তারা। [একে অন্যে পরিপূরক] [একে হচ্ছে খণ্ডিত—অসম্পূর্ণ। আর, একের সঙ্গে এ মিললে তবেই হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ—সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ।]

॥ সমাপ্ত ॥